মৌচাক

ফাল্গুন
১৩৬৫

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার সম্পাদিত

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ডকপি : শ্রুভাবতী চক্রবর্তী

স্ক্যান ও এডিট : সুজিত কুন্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

জলকে চল (টেবল-টপ ফটোগ্রাফি)
ফটো : শ্রীসুব্রত রায়

দলে দলে যাত্রী চলে
শিল্পী : শ্রীশিবানী রায়চৌধুরী

৩৯ বর্ষ] ফাল্গুন—১৩৬৫ [১১শ সংখ্যা

গ্রাহক-গ্রাহিকা সংখ্যা

বর্তমান সংখ্যাখানি 'গ্রাহক-গ্রাহিকা সংখ্যা' হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে। এই সংখ্যায় ধারাবাহিক লেখাগুলি ছাড়া আর সবই প্রায় গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা। অধিকাংশ ছবিগুলিও আঁকা তাদেরই। এই সংখ্যার জন্য গল্প, প্রবন্ধ বা অন্যান্য রচনা অপেক্ষা কবিতাই এসেছিল অধিক। সে জন্য সাধারণ সংখ্যার চেয়ে কিছু বেশী কবিতা এই সংখ্যায় ছাপতে হয়েছে। ভালমন্দ মিশিয়ে লেখা এসেছিল অনেক, কিন্তু স্থানাভাবে অনেক ভাল লেখাও ছেপে ওঠা সম্ভব হয়নি। উক্ত ভাল লেখাগুলির মধ্যে কতকগুলি ক্রমশঃ পরবর্তী সংখ্যায় গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখার পাতায় ছাপা হবে।

এই অবসরে তোমাদের মধ্যে যাদের লেখক-লেখিকা হিসাবে নাম করার আগ্রহ আছে তাদের জন্যে দু'চারটি কথা বলি।

কবি ও সাহিত্যিকদের একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা আছে, তাঁরা ঠিক অন্য উপজীবিকার সাধারণ মানুষের মত নন। অন্য পেশার মানুষরা লেখকদের চেয়ে

হয়ত অনেক বেশী উপার্জন করে থাকেন, তাঁদের উপার্জনের কাছে লেখকদের উপার্জন হয়ত খুবই কম, কিন্তু তাহলেও লেখকদের মর্যাদা অনেক বেশী এই কারণে যে,—তাঁরা স্বাধীন, তাঁরা স্রষ্টা। এই সৃষ্টির আনন্দ অনেক সময় তাঁদের অর্থ উপার্জনের আনন্দকেও ম্লান করে দেয়। তাই নানা দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও তাঁরা লিখে যান অক্লান্ত-ভাবে। লেখনীর শক্তিও অসীম। সেইজন্য ইংরেজীতে একটি কথা আছে, 'Pen is mightier than sword.' অর্থাৎ অসির চেয়ে লেখনী অধিকতর শক্তিশালী। সত্যিই রচনার সাহায্যে একটি জাতিকে, সমাজকে সহজেই প্রভাবিত করা যায়। ব্যক্তিগতভাবেও মানুষকে অনুপ্রাণিত করে উঁচুদরের সাহিত্য। এই সাহিত্য মানুষের মনে যেমন উচ্চ আদর্শের প্রেরণা যোগাতে পারে, তাকে আনন্দ দিতে পারে, তেমনি পারে দুঃখ, ভীতি ও বিস্ময়ের উদ্রেক করতে। লেখার বিষয়বস্তুর তারতম্যে ও লেখকের রচনাশক্তির গুণে এইসব অবস্থাগুলি জীবন্ত হয়ে ফুটে ওঠে পাঠকের মনে এবং কাল্পনিক ঘটনাও সত্য বলে তাদের মনের উপর রেখাপাত করে।

কিন্তু এই লেখার জন্যও অনুশীলন চাই, শিক্ষা চাই, আর চাই ঐকান্তিক নিষ্ঠা। ভাল লেখক হতে হলে সবচেয়ে যা প্রাথমিক প্রয়োজন, তা হচ্ছে ভাল করে লেখাপড়া করা। পড়াশোনা না করলে কিছুতেই ভাল লেখক হওয়া যায় না। সেই জন্যে তোমাদের মধ্যে লেখক হবার আগ্রহ যাদের, তাদের আগে খুব ভাল করে পড়া-শোনা করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ একবার এই লেখার বিষয় কথা প্রসঙ্গে একটি ছেলেকে বলেছিলেন, "ছোটবেলায় প্রথম বিদ্যারম্ভের সময় আগে আমরা লিখি ব'লে, অর্থাৎ আমাদের 'হাতেখড়ি' হয় ব'লে, আমরা বলি 'লেখাপড়া'। কিন্তু লেখক হতে হ'লে তোমায় বাপু সবার আগে পড়তে হবে বেশী ক'রে, এবং সে ক্ষেত্রে 'লেখাপড়া' না হয়ে হবে 'পড়ালেখা'।"

কথাগুলি যে কত সত্যি তা তোমরা যখন ভালভাবে লেখাপড়া করে মানুষ হয়ে উঠবে তখন বুঝতে পারবে।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

সামনে বিশাল-বিপুল জনতা। শুধু একতাল নির্বিচার মানুষের পিণ্ড নয়, শিক্ষিত বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবীদের ভিড়। তার মধ্যে যাজক-পুরোহিতও অসংখ্য। পৃথিবীর ইতিহাসে কস্মিনকালেও হয়নি এত বড় ধর্মসভা। একই মঞ্চে পৃথিবীর সমস্ত ধর্মের সম্মিলন। কি করে বলব এদের সামনে দাঁড়িয়ে? স্বামীজির গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, বুক কাঁপছে ঢিপঢিপ করে, হাতে-পায়ে বল-বশ কিছু নেই।

প্রথমেই বলতে উঠল গ্রীক চার্চের প্রতিনিধি, জান্তের আর্কবিশপ। তারপরে প্রতাপ মজুমদার। তারপরে পুং কুয়াং ইউ, কনফুসিয়ানিজম-এর প্রবক্তা। তারপরে চক্রবর্তী। তারপরে বৌদ্ধ ধর্মপাল।

'এবার আপনি।' স্বামীজিকে চিহ্নিত করলেন সভাপতি।

'আমার নম্বর তো একত্রিশ।' বললেন স্বামীজি।

'তা হোক। এখনই বলুন। এ সকালের পর্বেই।'

'না, এখন না।' গম্ভীর হলেন স্বামীজি। 'পরে বলব।'

স্বামীজি দেখলেন সবাই কেমন লিখে এনেছে বক্তৃতা। কি বলবে সব গুছিয়ে-গাছিয়ে তৈরি করে এনেছে। নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলেন স্বামীজি—তাঁর কেন এমন বুদ্ধি হয়নি? এখন আর লেখবার সময় কোথায়? কোথায় বা মিলবে এখন গবেষণার মালমশলা?

কেমন সবাই সানন্দ হাততালি পাচ্ছে, তার বেলায় সবাই বোধহয় ছি-ছি করে

উঠবে, ছি-ছি না করুক হয়তো বসে থাকবে বিরসমুখে। সভায় কোনো দীপ্তি থাকবে না, স্বাদ থাকবে না, স্ফূর্তি থাকবে না। সব বিবর্ণ নিষ্প্রভ হয়ে যাবে।

বিকেলের পর্বে প্রথমেই ডাক পড়ল স্বামীজির।

'এখন না।'

লোকটা কি দেবেনা নাকি বক্তৃতা? বারে-বারে এড়িয়ে যাচ্ছে কেন? সমুদ্রের মত জনতা দেখে ঘাবড়ে গিয়েছে বুঝি? দু'চার কথা বলবার মতও সাহস নেই?

আবার ইঙ্গিত এল স্বামীজির কাছে।

'আরো পরে।'

এ কি অকরণ! যদি মুখ বুজে নিষ্ক্রিয় হয়েই থাকবে তবে এলে কেন? আসবার জন্যে, টিকিট পাবার জন্যে কত না লড়াই করেছিলে? ভেবেছিলে এ বুঝি ক্লাবঘরে বক্তৃতা না কি মাঠের চীৎকার। যে ধর্মের প্রতিনিধিই এমন ভীরু সে ধর্মের আবার আস্ফালন কি।

চুপ করে আছ, তবে চুপ করেই থাকো।

আরো চার-চার জন প্রতিনিধি তাদের লিখিত বক্তৃতা পড়লেন। যথারীতি হাততালি পেলেন সকলে।

প্রার্থনার ভঙ্গিতে আত্মস্থের মত বসেছিলেন এতক্ষণ, এবার উঠে দাঁড়ালেন স্বামীজি। এবার স্বামীজির বলবার লগ্ন।

দেখ, দেখ, কে দাঁড়িয়েছে মঞ্চে। যৌবনোজ্জ্বল কি মহৎ মূর্তি! কি আশ্চর্য সুন্দর পোশাক। দেখ, দাঁড়াবার কি দৃঢ়দীপ্ত ভঙ্গি। আর চোখ দেখেছ? প্রেম আর প্রার্থনা একসঙ্গে। বীর্য আর মাধুর্যের সংযোগ। পবিত্রতায় জ্বলছে যেন আগুনের মত।

কী না জানি বলে! কী না জানি তার বলবার!

সরস্বতীকে মনে-মনে বন্দনা করলেন স্বামীজি। মঞ্চে যিনি অধিষ্ঠিতা সেই বিদ্যাধিদেবীকে নমস্কার।

ঋষিসূক্ত মনে পড়ল বোধহয়।

কেউ বাণীকে দেখেও দেখেনা, শুনেও শোনেনা। কিন্তু কারো-কারো কাছে তিনি আপন স্বরূপ প্রকট করেন যেমন সুবাসা স্ত্রী পতির নিকট প্রকাশিতা।

যিনি ব্রহ্মার মুখে বিরাজমানা সেই সর্বশ্বেতকান্তি সরস্বতী আমার মানসসরসে নিত্য বিহার করুন। হে দেবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠা, মাতার মধ্যে শ্রেষ্ঠা, নদীর মধ্যে শ্রেষ্ঠা, আমাকে বিদ্যা দাও, প্রশস্তি দাও, দাও প্রতিভা-কল্পনা তোমার চারহাতে অক্ষসূত্র, অঙ্কুশ, পাশ আর পুস্তক। তুমি আমার জিহ্বাগ্রে বাস করো। তুমিই শ্রদ্ধা, তুমিই মেধা, তুমিই ধারণা। তুমিই মধুচ্ছন্দা। হে স্মিতমুখী সুভগে, তোমাকে নমস্কার। 'মাতর্মাতর্নমস্তে দহ দহ জড়তাং দেহি বুদ্ধি প্রশস্তাং। শাস্ত্রে বাদে কবিত্বে প্রসরতু মমধীর্মাস্তু কুণ্ঠা কদাচিৎ॥'

প্রথম কথা কী বললেন স্বামীজি? কী তাঁর সম্ভাষণ?

লেডিস য়্যাণ্ড জেণ্টলম্যান নয়, বললেন, সিস্টার্স য়্যাণ্ড ব্রাদার্স অফ আমেরিকা। এ আর এমনি কি নতুন বললেন? মামুলি লেডিস য়্যাণ্ড জেণ্টলম্যান-এর চেয়ে বেশি কি অভিনব! এতক্ষণ ধরে ভাষণে-বক্তৃতায় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে এই কথাই তো বারে-বারে বলা হয়েছে যে সবাই আমরা এক পিতার সন্তান, পরস্পর সবাই আমরা ভাই-বোন। তাই স্বামীজির এই সম্বোধনে এমন কি বাহাদুরি!

বাহাদুরি এইখানে যে, ও শুধু মুখের কথা নয় ও প্রাণের কথা, সত্যের স্পর্শে গদ্গদ! শুনেছ কি উদাত্ত কণ্ঠ, যেন মুক্তদ্বার মন্দিরের ঘণ্টা বাজছে, আর এ স্বর তাপে তেজে ছন্দে গন্ধে অপরূপ। যদি এমনি কথার কথা হত, যদি না থাকত এতে সারল্যের সম্পদ, অন্তরের অমৃত, তাহলে কে করত প্রতিধ্বনি। বায়ুতরঙ্গে আরো অনেক কথার মত মিলিয়ে যেত বুদ্বুদ হয়ে।

কিন্তু এ বলায় হল কি? করতালিতে উত্তাল হয়ে উঠল জনতা। এ মামুলি করতালি নয়, এ রুদ্ধ হৃদয়ের উদ্ঘাটন। উল্লাসের জলপ্রপাত। শেষের সমর্থন নয় আরম্ভের অভ্যর্থনা। আরম্ভের জয়ধ্বনি।

এক মিনিট, দু মিনিট, তিন মিনিট—থামতে চায়না। এমন করে কে কবে বলেছে! কণ্ঠস্বরে মিশিয়েছে এমন প্রগাঢ় আন্তরিকতা! কার এমন তেজঃপুঞ্জ ব্যক্তিত্ব! কার এমন উদার-উজ্জ্বল ভঙ্গি! শুধু একটা ভাবালুতা

নয় কার এমন সত্যের স্পষ্টতা! আমেরিকাবাসীর মধ্য দিয়ে বিশ্ববাসীকে সম্বোধন!

উতরোল থামতে চায়না কিছুতেই। উৎসাহে দাঁড়িয়ে পড়েছে অনেকে। হাততালির শব্দে মনে হচ্ছে দেয়াল-ছাদ ভেঙে চৌচির হয়ে যাবে। সমুদ্র হয়ে যাবে মানুষের জনতা। মানুষের হৃদয়।

একটি শব্দের জাদুস্পর্শে এমন অঘটন ঘটবে কল্পনার অতীত ছিল স্বামীজির। তিনি কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইলেন। বুঝলেন একেই বলে আদ্যাশক্তি, মাতৃশক্তির লীলা। একেই বলে কৃপাশক্তির বিস্ফোরণ।

কিন্তু লোকজন একটু শান্ত নাহলে আমার বক্তব্যটুকু পেশ করি কি করে? শান্ত স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন স্বামীজি। শান্ত, স্থির হয়ে গেল জনতা।

বলতে শুরু করলেন স্বামীজি। প্রথমেই পৃথিবীর তরুণধর্মদের প্রাচীনতম ধর্মের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা করলেন। আর সব ধর্ম নতুন, হিন্দুধর্ম প্রাচীনতম। আর সবধর্ম প্রবর্তিত হয়েছে, হিন্দুধর্ম সনাতন। হিন্দুধর্মই সমস্ত ধর্মের জননী।

হিন্দুধর্ম দুটো জিনিস শিখিয়েছে—সহনশীলতা আর বহনশীলতা। শুধু সইবনা, সঙ্গে করে বয়ে নিয়ে বেড়াব। পথ দিয়ে তুমিও চলো আমিও চলি—হিন্দুধর্ম শুধু এইটুকুই বলেনা, বলে, ভাই, কাছে এসে, হাতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলো। হিন্দু-ধর্ম শুধু মেনে নেয়না, টেনে নেয়।

আর হিন্দুধর্ম এ শেখায়, সবধর্মই সমান মহান্। সবধর্মই পৌঁচেছে ঈশ্বরে। সবরাস্তাই রোমে। যে পথ দিয়েই হোক, সোজাই হোক আর আঁকাবাঁকাই হোক, সব নদীই যেমন পড়ছে গিয়ে সমুদ্রে, তেমনি সবধর্মই মিলছে গিয়ে সেই পরমবিরামে। 'যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।' এ কথাই আমার গুরু, আমার দক্ষিণেশ্বর, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস নিজের জীবন দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। জাতীয়-বিজাতীয় হেন সাধন নেই তিনি করেননি, কিন্তু সব সাধনেরই শেষ স্বাদ ঈশ্বর। যত পথ আছে তিনি বিচরণ করেছেন, যত মত আছে আচরণ করেছেন, এবং বলেছেন, যত মত তত পথ। মতই আর ঈশ্বর নয়, পথই আর প্রাপ্তি নয়।

কিন্তু সব মতে সব পথেই সেই পরম সম্বোধি। পথ বিচিত্র কিন্তু প্রপ্তি এক। মত বিচিত্র কিন্তু মানুষ এক, মানুষের ঈশ্বর এক।

মিনিট পাঁচেক বললেন স্বামীজি এবং বলার শেষে যখন বসলেন সমস্ত আমেরিকা তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়েছে।

আর কারো বক্তৃতা শুনতেই চায়না জনতা। এর পরে আর যেন কিছু বলবার নেই। গাইবার নেই। আমাদের ছেড়ে দাও। আমরা যাব ঐ ভারতীয় সাধুর কাছে। আমরা তাঁকে আরো কাছে থেকে দেখব। আরো অন্তরঙ্গ হয়ে শুনব। ধরব তাঁর ঐ গেরুয়া আলখাল্লা।

আর, দেখেছ, কি সুন্দর ইংরিজি বলছে! স্পষ্ট, দ্রুত ও সাধু ইংরিজি! এমন অবলীলায় বলছে এ যেন তাঁর মাতৃভাষা। কোথায় শিখল এমন বলবার নৈপুণ্য! জনতাকে দাবিয়ে রাখবার ক্ষমতা! বিদেশী ইস্কুলে-কলেজে পড়েছে নাকি কোনো-দিন? মাঠে-পর্বতে ঘোরা সাধু, এদের আবার শিক্ষায় রুচি, তার আয়াস! তবে এর বেলায় এ অসাধ্য সম্ভব হয় কি করে? সন্দেহ কি, অর্থশক্তি নয়, আত্মশক্তি—অধ্যাত্মশক্তি।

'দর্শন' বলে কোনো কিছু জানতনা আমেরিকা, কিন্তু স্বামীজির দর্শন পাবার জন্যে সবাই খেপে উঠল।

কি সুস্নিগ্ধ আয়তশান্ত চোখ দেখেছ। যদি একবার মুখের দিকে তাকায় মনে হয় যেন প্রাণ জুড়িয়ে গেল। পবিত্র হল দেহ-মন। ভেসে উঠল যেন আরেক জগতের ইশারা। চলো চলো এগিয়ে চলো ভিড় ঠেলে। এমন নয়নের প্রসাদ নেবেনা?

'দেশে তুমি থাকো কোথায়?' কে একজন জিগগেস করলে।

'কখনো পাহাড়ে পর্বতে কখনো বা বাজারেবন্দরে। কখনো বা শহরের ফুটপাতে। আমি সর্বস্বাধীন। সর্বত্র আমার গতিবিধি। রাজপ্রাসাদ থেকে গরিবের কুটির, ভিখিরির গাছতলা।'

'খাও কি?'

'যখন যা জোটে। না জোটে তো খাইনা।'

'করো কি?'

'মাধুকরী।'

'পয়সা নেই?'

'একটা কপর্দকও না।'

কে একজন পোশাকে আকৃষ্ট হয়েছে। বললে, 'এই বুঝি তোমার দেশের সাধুদের পোশাক?'

'এ তো তোমাদের দেশের বিশেষ এ-অনুষ্ঠানের জন্যে। এ তো ভালো, ভদ্রতম পোশাক। দেশে আমার গায়ে হয় ছেঁড়া কানি, নয়তো চট কিংবা চামড়া।

'জাত মানো?'

'মানিনা।' গম্ভীর হলেন স্বামীজিঃ 'জাতটা আমাদের সামাজিক প্রথা, ধর্ম নয়।'

'বিয়ে করোনি কেন?' এ একটি তরুণীর প্রশ্ন।

'কাকে বিয়ে করব? যে কোন মেয়ের দিকে তাকাই আমার মা, জগন্মাতাকে দেখি।'

হোটেলে ফিরে এসে কাঁদতে বসলেন স্বামীজি। ঈশ্বরের কৃপার কথা ভেবে নয়, মূককে বাচাল করেছেন সে কৃতজ্ঞতায় নয়, কাঁদতে বসলেন বঞ্চিত অধঃপতিত দেশবাসীদের দুঃখের কথা ভেবে। আমার দেশের লোকের যখন এত দুঃখ এত দারিদ্র্য তখন এই যশ ও সমাদর দিয়ে আমার কী হবে! যদি দেশকে টেনে তুলতে পারি এই অভাবের পঙ্ককুণ্ড থেকে, তবেই আমার যশ তবেই আমার সমাদর। (ক্রমশঃ)

মৌচাকের বার্ষিক মূল্য

আগামী বৎসর ১৩৬৬ সাল হ'তে মৌচাকের বার্ষিক মূল্য ৪ টাকা ২৫ নয়া পয়সার স্থলে ৫ টাকা করা হোল। কাগজের মূল্য অসম্ভব রকম বেড়ে গিয়েছে। কাগজের মূল্য কেবল বৃদ্ধি নয়, কাগজ সংগ্রহ করাও এক রকম অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এ জন্য ঠিক সময় কাগজ বের করাও সম্ভবপর হচ্ছে না। এর উপর আছে গভর্নমেণ্টের বিক্রয় কর। মৌচাককে বাঁচিয়ে রাখতে হলে এই সামান্য দাম বাড়ানো ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। সেজন্য আমরা সকল গ্রাহক-গ্রাহিকাকে ও তাঁদের অভিভাবকদের অনুরোধ করছি, তাঁরা যেন এই সামান্য বর্ধিত মূল্য দিয়ে আমাদের সাহায্য করবেন।

বার্ষিক মূল্য—৫৲ টাকা, ছয় মাসের মূল্য—২·৫০ প্রতি সংখ্যা—·৫০ নয়া পয়সা

এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স (পি) লিমিটেড

১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

বন্ধু

শ্রীসুশান্ত চক্রবর্তী

দুই বন্ধু। প্রদীপ আর শঙ্কর। গলায়-গলায় ভাব দু'জনে। জন্মাবধি একই গ্রামে তারা বাস করত। প্রদীপ বিত্তশালী পিতার একমাত্র সন্তান। তার বাবা বর্ধমানের এক-জন নামকরা উকিল।

শঙ্কর চাষার ছেলে। চাষ করাই তার পূর্বপুরুষদের একমাত্র উপজীবিকা।

গ্রামের মাইনর স্কুলে পড়বার সময়েই দু'জনের বন্ধুত্ব হয়। কিন্তু কি কোরে এক ধনীপুত্রের সঙ্গে চাষার ছেলের ভাব ঘনিষ্ঠ হোলো সে ইতিহাস আমাদের জানা নেই। যাক্ সে কথা। হ্যাঁ, তারপর মাইনর স্কুলের পড়া শেষ কোরে প্রদীপ বর্ধমান থেকে ম্যাট্রিক ও আই.-এস্‌সি পাস কোরে কোলকাতায় ডাক্তারী পড়তে যায়।···

এদিকে শঙ্কর মাইনর স্কুলেই পাঠ শেষ কোরে চাষবাস আরম্ভ করে।···

প্রদীপ যখন ডাক্তারী পাস কোরে গ্রামে ফিরে এলো, তখন সবচেয়ে বেশী আনন্দ হোয়েছিলো শঙ্করের। প্রদীপ যখন গোরুর গাড়ি থেকে নামলো নিজের বাড়ীর সামনে, তখন শঙ্কর কি কাজে সেখান দিয়ে যাচ্ছিলো, প্রদীপ গাড়ি থেকে নামতেই সে বাল্যবন্ধুর কাঁধে হাত রেখে বল্‌লে,—'কি রে, পুরোন বন্ধুকে ভুলে যাসনি তো?' প্রদীপ কোনো কথা না বলে গম্ভীরভাবে তাচ্ছিল্যভরে শঙ্করের হাতটা কাঁধ থেকে নামিয়ে দিলো। কিন্তু শঙ্কর তাতে একটুও ক্ষুণ্ণ হোলো না। ভাবলে, ও তেতে-পুড়ে এসেছে তাই মেজাজটা একটু খারাপ হোয়েছে। একে উপেক্ষা বলে না।···

এ সব ঘটনার পরও প্রায় পাঁচ-ছ'বছর কেটে গেছে। প্রদীপ আর শঙ্কর দু'জনেই এখন বিবাহিত। প্রদীপের একটিমাত্র ছেলে, তার নাম আশিস। বয়স, বছর তিন। শঙ্করের দুই ছেলে, এক মেয়ে।

শঙ্কর সময় পেলেই বন্ধুর বাড়ী যায়, কিন্তু বেশীরভাগ দিনই প্রদীপের দেখা পায় না। যেদিন প্রদীপ বাড়ী থাকে, সেদিনও শঙ্করের দেখা পেলেই সে দু'চারটে কথা বলেই প্রয়োজনের অছিলায় বাড়ী থেকে বেড়িয়ে যায়।

শঙ্কর ভাবে, আহা ওর এত খাটুনি, যে, বেচারা নিঃশ্বাস ফেলবার সময় পায় না। ডাক্তার-মানুষদের গল্প করবার সময় কোথায়!

আসল ব্যাপার কিন্তু অন্যরকম।

প্রদীপ ভাবতো, আমি একজন বড় ডাক্তার, আমি কেন সম্মান খুইয়ে ওই ছোটোলোক চাষার

'শঙ্কর আর চোখের জল চাপতে পারলে না'

সঙ্গে গল্প করবো? ছোটো বেলায় বন্ধুত্ব হোয়েছিলো বোলে এখনও তার জের টানতে হবে নাকি?

প্রদীপ শঙ্করকে এড়িয়ে গেলেও, প্রদীপের ছোট্টছেলে আশিস শঙ্করকে খুবই ভালোবাসতো। শঙ্কর প্রায়ই তাদের বাড়ী গিয়ে আশিসকে কত রূপকথার গল্প শোনাতো, ছোটো ছেলে সেজে তার সঙ্গে খেলা করতো, কোনো কোনোদিন তাকে কাঁধে কোরে বেড়াতে নিয়ে যেত। প্রদীপ বেশীরভাগ দিনই বাড়ী না থাকায় এ সবের কোনই অসুবিধা হোতো না। আশিস তাই শঙ্কর কাকু বলতে অজ্ঞান।

সেদিন প্রদীপ আর ওদের চাকর ঘনাই-এর কাঁধে চেপে আশিস কোথায় যেন যাচ্ছিলো, শঙ্করের বাড়ীর সামনে দিয়ে। শঙ্কর তখন দাওয়ায় দাঁড়িয়ে তার সাধের চন্দনাটাকে 'সীতারাম' পড়াচ্ছিলো। চাকরের কাঁধে আশিসকে দেখে 'আশিসবাবু' বোলে ছুটে গিয়ে চাকরের কাছ থেকে ছিনিয়ে তাকে কোলে তুলে নিলো।

প্রদীপ গম্ভীরভাবে বল্‌লে,—'ওহে, ওর নতুন স্যুটটা ময়লা করে দিও না।'

আশিস পাখীটাকে দেখেই তার কচি তুল্‌তুলে হাত বাড়িয়ে—'পাখীটা আমাকে দাও-দাও' বোলে চেঁচাতে লাগলো। শঙ্কর আশিসকে খাঁচার কাছে নিয়ে গেল। আশিস খাঁচার ভেতর আঙুল ঢুকিয়ে পাখীটাকে আদর করতে লাগলো আর নানারকম কথা বোলতে লাগলো তার সঙ্গে। হঠাৎ কখন সে খাঁচার দরজাটা খুলে দিয়েছে শঙ্কর তা' লক্ষ্য করেনি। পাখীটা এই সুযোগ নষ্ট না কোরে সেই

মুহূর্তেই ফুড়ুৎ করে আকাশে উড়ে গেল। শঙ্কর সেদিকে চেয়ে শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্‌লে। খোকাকে পাখীর জন্যে কাঁদতে দেখে প্রদীপ বল্‌লে,—'হ্যাঁ হে শঙ্কর, পাখীটাকে আকাশে উড়িয়ে দিলে, তবুও আশিসকে দিতে পারলে না?'

শঙ্কর আর চোখের জল চাপতে পারলে না। কয়েক ফোঁটা চোখের জল তার গালে গড়িয়ে পড়ে অস্তগমী সূর্যের আলোয় চিক্‌চিক্ করতে লাগলো।

দিন চারেক পরের কথা। শঙ্করের ছোটো ছেলের খুব অসুখ হোলো। গ্রামেই বন্ধু ডাক্তার, কাজেই শঙ্কর ছুটে গেল প্রদীপের কাছে। প্রদীপ এলো অবশ্য এবং এসেই দু'মিনিটে ছেলেটিকে পরীক্ষা কোরে প্রেস্‌ক্রিপশন্ লিখে দিয়ে, তারপর ফিয়ের জন্যে হাত পাতলে। শঙ্কর আশা করেছিলো প্রদীপ হয়ত ফিয়ের টাকা নেবে না, কিন্তু তারপর ভাবলে, আহা, টাকা না নিলে ওর চলবে কি কোরে! সে দু'টাকা বের করে দিলে বাক্স থেকে। প্রদীপ অসঙ্কোচে তা' পকেটে ফেলে দিলে।...

দু'মাস পরের ঘটনা। শ্রাবণ মাসের এক বিকেল। তিন দিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টির পর সেদিনই সবে আকাশটা ধরেছে। এই অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে গ্রামের আঁকাবাঁকা পথগুলো বড় বেশী পিছল হোয়ে গেছে। ছোটবড় কোনো ডোবা পুকুরই খালি নেই, সবই জলে ভরা। রাস্তা, ঘাট, মাঠ, বাড়ীর কাঁচা উঠোন সব জায়গাতেই কচি কচি ঘাস গজিয়েছে।

বৃষ্টি থেমে যেতেই প্রদীপ আর বাড়ীতে থাকতে পারলে না। সে আশিসকে কোলে নিয়ে বেড়াতে বেরোল। কিছুদূর গিয়ে আশিস বায়না করতে লাগলো,—'বাবা আমি হেঁটে যাবো।' অগত্যা প্রদীপ তাকে কোল থেকে নামিয়ে দিলে। বেড়াতে বেড়াতে তারা খালের ধারে যেতেই সেখানে শঙ্করের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তাদের। শঙ্কর তখন গামছায় কোরে খাল থেকে কিছু মাছ ধরে বাড়ী যাবার পথে পা বাড়িয়েছিলো, ওদের দেখেই ছুটে এসে সে বল্‌লে,—'কি খবর আশিসবাবু?'

আশিস হেসে বল্‌লে,—'ভালো।'

শঙ্কর তাকে কোলে নিতে গেল, কিন্তু আশিসের তা' মনঃপূত হোলো না। কারণ, সে তখন দেখছিলো খালের ধারে একটা গাছে কিসুন্দর কদম ফুল ফুটে আছে।

দেখে তার লোভ হওয়ায় সে আস্তে আস্তে এগুচ্ছিল ঐ গাছটার দিকে।

আশিস যে ফুল নিতে এগিয়েছে, শঙ্কর বা প্রদীপ কেউই তা' লক্ষ্য করেনি। প্রদীপ শঙ্করকে তখন বলছিলো,—'ওহে, তোমার স্ত্রীকে সেদিন যে দেখেছিলাম তার ফিটা দিয়ে দিও। হাতে একটাও—'

হঠাৎ শঙ্কর চিৎকার কোরে উঠলো। প্রদীপ মুখ ফিরিয়ে দেখলে আশিস পা পিছলে খালের

জলে হাবুডুবু খাচ্ছে, এখুনিই তলিয়ে যাবে। প্রদীপ জলে লাফাতে গিয়েও ইতস্তত: করতে লাগলো, কারণ, সে মোটেই সাঁতার জানতো না। শঙ্কর এক মুহূর্ত দ্বিধা না কোরে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। তারপর সাঁতরে গিয়ে জল থেকে আশিসকে তুলে তাকে পিঠে ফেলে ডাঙার দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। ঠিক এমনি সময় হঠাৎ চিৎকার কোরে উঠে শঙ্কর আশিসকে ডাঙার দিকে ছুড়ে দিলো—প্রদীপ ধরে নিলো তাকে। শঙ্করকে এসে তখন গ্রাস করেছে নিয়তি—এই খালে-ছিল ভয়ঙ্কর সব কুমীরদের বাস। হিংস্র একটা কুমীর শঙ্করকে টেনে নিয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে জলের অতলে।

যে বন্ধু ধন-মানের গর্বে নিজের সুহৃদকে কখনো আপন ভাবেনি, সব সময় যাকে উপেক্ষা করে এসেছে, সেই গ্রাম্য, সরল বন্ধু শঙ্কর বন্ধু-পুত্রের জন্যে কত সহজে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিলে!

বেলা শেষে

শ্রীঅনুরাধা বসু

খেয়াল খাতার হিজিবিজি
বন্ধ করো কবি।
দিন যে তোমার ফুরিয়ে এল
নিবছে জীবন-রবি॥
মৃত্যু এসে দাঁড়ায়ে আছে
তোমার আঙিনাতে।
সাঁঝের বাতি উঠছে কাঁদি
ব্যথা-ঝরা রাতে॥

দুঃখ তোমার সাজে নাকো
কাঁদছ কেন তুমি?
নীরব রাতে ঘুমিয়ে পড়
ধরার আঁচল চুমি॥
যা লিখেছ এই জীবনে
তাই হয়েছে বেশ।
তুলির টানে উঠল ফুটে
নতুন সুরের রেশ॥

কবি, তোমার সাধের পূজা
হবে নাকো হারা।
তোমার গানই গাইছে দেখ
সন্ধ্যা রাতের তারা॥

প্রতীক্ষা

শ্রীপার্থ দত্ত ও শ্রীসিদ্ধার্থ দত্ত

*

ট্রেনের কামরায় প্রভুকে খুঁজে বেড়াচ্ছে পিটার

বিলেতের কোন শহরের উপকণ্ঠে একটি ছোট গ্রাম। সেখানে এক ভদ্রলোক বাস করতেন। আপনার জন বলতে তাঁর প্রায় কেউই ছিলো না। থাকবার মধ্যে ছিলো একটি কুকুর। তার নাম "পিটার"। প্রভুকে প্রাণভরে ভালবাসতো সে।

ভদ্রলোকটি রোজ সকালে ট্রেনে করে শহরে একটি কারখানায় কাজ করতে যেতেন এবং ফিরে আসতেন বিকেল পাঁচটার ট্রেনে। কুকুরটি রোজই সকালে প্রভুর সঙ্গে স্টেশনে আসতো এবং যতক্ষণ না ট্রেন ছেড়ে যেত ভদ্রলোকের কাছ থেকে নড়তো না। যখন ট্রেনটি দৃষ্টির বাইরে চলে যেতো, তখন পিটার একাই বাসায় ফিরে আসতো। সারাদিন সে প্রভুর বাসা পাহারা দিতো, আবার বিকেল পাঁচটার আগেই স্টেশনে এসে হাজির হতো তার প্রভুকে আনবার জন্যে। হুইসিল বাজিয়ে ট্রেনটি স্টেশনে এসে ঢুকতো যখন, তখন পিটার ট্রেনের এ প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দৌড়তো তার প্রভুর খোঁজে। ভদ্রলোক যখন ট্রেন থেকে নামতেন, তখন পিটার কি করে যে তার আনন্দ প্রকাশ করবে ভেবে পেতো না। ভদ্রলোককে নিয়ে সে বাসায় ফিরে আসতো। তারপর সারা বিকেল, সারা সন্ধ্যে, তারা বন্ধুর মতো কাটাতো। এমনকি রাত্রেও পিটার তার প্রভুর খাটের উপর, তাঁর বিছানায় শুয়ে থাকতো। এমনিভাবে তাদের অনেক দিন কেটে যায়।

এরপর হঠাৎ একদিন ভদ্রলোক কর্মস্থলে তাঁর কারখানায় কি এক দুর্ঘটনায় মারা গেলেন। তাঁর দেহ এমন ভাবে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো যে, সৎকারের জন্য মৃতদেহ গ্রামে আনা আর সম্ভব হলো না।

সেদিনও পিটার স্টেশনে এসেছেলো হুইসিল বাজিয়ে ট্রেনও যথাসময়ে প্ল্যাটফর্মে ঢুকলো, কিন্তু ভদ্রলোককে ট্রেন থেকে নামতে না দেখে পিটার অস্থির হয়ে উঠলো। তার আকুল চীৎকারে সারা প্ল্যাটফর্ম সচকিত হয়ে উঠলো। প্রত্যেক কামরায় খুঁজতে লাগলো সে। কিন্তু কোথাও তার প্রভুকে পেলো না। একে একে প্রত্যেকটি লোক ট্রেন থেকে নেমে গেলো। প্লাটফর্ম খালি হয়ে গেল। পিটার ক্রমে অধৈর্য হয়ে উঠতে লাগলো। তবে কি তার প্রভুর কোন বিপদ হয়েছে! ক্লান্ত হয়ে শেষে প্লাটফর্ম-এর একপ্রান্তে বসে রইলো পিটার। ঘণ্টা দুই পরে আরেকটি ট্রেন এলো। পিটার এবারও ট্রেনের সবগুলি কামরা খুঁজে এলো, কিন্তু প্রভুকে সে পেলে না। এইভাবে স্টেশনে যতগুলি ট্রেন আসতে লাগলো, পিটার সবগুলিই খুঁজতে লাগলো। ক্রমে রাত গভীর হলো, কিন্তু পিটার আর স্টেশন ছেড়ে বাড়ী গেল না। তার প্রভুকে নিয়ে তবে সে যাবে, আর তিনি তো এই পথেই আসবেন।

রাত ভোর হলো। নূতন ট্রেন আসার সঙ্গে আবার নূতন উদ্যমে খুঁজতে সুরু করলো পিটার। কিন্তু সবই বৃথা। খাওয়াদাওয়া ভুলে সে প্রত্যেকটি ট্রেনের প্রত্যেকটি কামরায় খুঁজে বেড়াতে লাগলো। এ ভাবে দিনের পর দিন পেরিয়ে সপ্তাহ গেলো, শেষে মাস এবং বছরও গড়িয়ে এলো।

শহরের সকলেই পিটারকে চিনতেন। তাঁরা তার এই অধীর প্রতীক্ষা দেখে চোখের জল আর আটকাতে পারতেন না। স্টেশনমাস্টার ওকে আদর-যত্ন করে খেতে দিতেন। এমনিভাবে স্টেশনে প্রতীক্ষারত পিটারের প্রায় ন'দশ বছর কেটে গেল। বুড়ো হয়ে গেল সে, কিন্তু তার প্রতীক্ষার আর শেষ নাই।

সেদিন শহরে বড়দিনের উৎসব। আকাশ থেকে অঝোরে পেঁজা তুলোর মত বরফ পড়ছে। ঠাণ্ডা বড় বেশী। পিটারের ক্লান্ত শরীর এই ঠাণ্ডার প্রকোপ যেন আর সহ্য করতে পারছে না। শেষ ট্রেনটা প্লাটফর্মে এসে ঢুকলো। পিটার উঠে দাড়াতে গেল, কিন্তু আর পারলো না।

পরের দিন সকালে খাবার দিতে এসে স্টেশনমাস্টার দেখলেন পিটারের প্রাণহীন দেহ।

শহরের লোকেরা তখন চাঁদা তুলে পিটারকে সমাধি দিলো আর তার উপর তুললো সুন্দর একটি সমাধিস্তম্ভ। পিটারের একটি ব্রোঞ্জের মূর্তিও তার উপরে বসিয়ে দিলো,—ঠিক যে ভাবে সে তার প্রভুর আশায় স্টেশনে বসে থাকতো সেই ভাবে, আর নীচে লিখে দিলো তার প্রতীক্ষার কাহিনী।

তোমরা যদি কেউ ঐ শহরে বেড়াতে যাও, তবে 'পিটারের' ঐ মূর্তিটি দেখে আসতে ভুলো না যেন।

কস্তুরী মৃগ

[উপন্যাস]

দেবাচার্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

মাটির ঘর, মেজেটা উঠোন থেকে প্রায় তিন হাত উঁচু, চারিপাশে চওড়া বারান্দা মাটি দিয়ে গাঁথা। আটচালা ঘর, এক কোণে মাচার উপর সাজানো আছে ছোট ছোট মাটির জালা। পুরোন খবরের কাগজের উপর বালি, বালির উপর কয়েকটা গোল আলু ছড়ানো। জালার মুখ সরা দিয়ে ঢাকা। জালার মধ্যে রান্নার চাল, সেদ্ধ আউশ, লাল আতপ, মুগের ডাল, মটর কলাই আলাদা আলাদা রাখা আছে। তালকাঠের কড়ি থেকে ঝুলোনো দড়ির শিকে, তার মধ্যে কাঁথা। বিচিত্র নক্সার কাঁথা, পর পর সাজানো। রঙ-বেরঙের পাড় দিয়ে সেলাই করা, ছুঁচের সেলাইয়ে নানা ধরনের ফুলপাতা আঁকা। রমা দেবীর ছুঁচের কাজের প্রশংসা করে সারা গাঁয়ের লোক। এমন কি, পাশের গ্রামের জমিদার গিন্নীও কাঁথা সেলাই-এর কৌশল শিখতে একদিন পাল্কী করে এসেছিলেন পিনাকীর মায়ের কাছে।

ঘরে ঢুকতেই পিনাকীর মনে পড়ে যায় কত কথা। মাচার তলায় কালো রঙের ভাঁড়, যাকে বলে ঢালন, সরষের তেল ঢেলে দেয় মা কৃষাণদের হাতে। রান্নার বোতলে রোজকার প্রয়োজন ঠিক করে নেওয়া এমন কিছুই কঠিন কাজ নয়, তবুও মা মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যায়। খানিকটা বাবার সাবধান বাণী—গৃহস্থের সংসারে অপচয় পাপ···ঠাকুরমার তিরস্কার থেকেও রক্ষা নেই।—তিনি বলেন, ওগো বড়লোকের মেয়ে, চোখ বুজে কি বাপের বাড়ীর ধ্যান করছ? দেখতে পাচ্ছ না, বোতল উপচে তেল পড়ে যাচ্ছে, আমি বুড়ো মানুষ, আমি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি।

অতীতের ছিন্নপত্র উড়ে চলে একটার পর একটা।...একদা পূর্ণস্বাস্থ্যের অধিকারিণী মায়ের এই স্বাস্থ্যহানি, কঠিন ব্যধির কারণ কি? মা ঘুমিয়ে আছে, মাদুরের উপর, ছেঁড়া তোশকের তুলো বেরিয়ে এসেছে। ঠাকুরমার জ্বর নেই আজ, বসে আছেন পুত্রবধূর পাশে, হাতপাখা দিয়ে বাতাস করছেন ঠাকুর মা। মায়ের সারা শরীর চাদর দিয়ে ঢাকা। পরিষ্কার কাপড়-চোপড়, বিছানা বালিস পছন্দ করেন মা। পুত্রবধূর সেবা করতে গিয়েই জ্বর বাধিয়েছে বুড়ী। এই বয়সে কি এত কাচাকাচি, জল-ঘাঁটাঘাটি সহ্য হয়? আপনি কেন ওগুলো কাচতে গেলেন?—ক্ষীণ কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়েছিল পুত্রবধূ। শাশুড়ী উত্তর দেন নি, কাঁথা মুড়ি দিয়ে কেঁপেছিলেন শুধু।

ঠাকুরমার বড় একটা জ্বরজারি হয় না। পাশের গ্রামেই তাঁর জন্ম। তাঁর জীবনের ইতিহাসে মাত্র একটিবার আবহাওয়ার পরিবর্তন হয়েছিল—যেবার তিনি গঙ্গা স্নান করতে গিয়ে ওঠেন ক'লকাতায় বেয়ানের বাসায়। ভালই ছিলেন, শুধু কয়লার ধোঁয়ায় একটু মাথা ধরেছিল, এই যা।

রূপকুমারীর রূপ ছিল, সন্দেহ নেই। গৌরবর্ণা, মুখ চোখ সুন্দর, কিন্তু রূপের সঙ্গে শরীরের ওজনও ছিল কম নয়। জনাপবাদ, বিয়ের পর বাড়ী ফিরবার পথে ঠাকুরমা ও ঠাকুরদা দু'জনে গলা জড়াজড়ি করে পালকী ছিঁড়ে পড়ে যান ধপাস্ করে খালের মধ্যে। দেওয়ান মারোর শুক্‌নো খাল, ভাগ্যিস্ বালি ছিল, কাদার মধ্যে পড়লে বিয়ের বেনারসীটাই নষ্ট হয়ে যেতো ঠাকুরমার।

গল্প শুনে হি হি করে হেসেছিলো পিনাকী। গ্রীষ্মের উত্তাপে বুকের উপর কাপড় রাখতে পারতেনা ঠাকুরমা। শীতলপাটি দাওয়ার উপর বিছিয়ে গড়াগড়ি দিতেন। পিনাকী প্রশ্ন করেছিল ঠাকুরমাকে—আচ্ছা ঠাকুমা, ঠাকুর্দা নাকি এক পোয়া ঘি হাতে করে নিয়ে চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলতেন?

ঠাকুরমার গল্প আর শেষ হতে চায় না।

এক পোয়া ঘি যিনি গণ্ডুষের ভঙ্গীতে খেয়ে ফেলতেন রোজ, দু'চার সের দুধও যিনি অবলীলাক্রমে পান করে করে সুস্থদেহে হেলতে দুলতে ক্রোশের পর ক্রোশ পথ অতিক্রম করে যেতেন যজমান ও শিষ্যবাড়ী, সেই পূর্বপুরুষ অগ্নিসম সুবর্ণকান্তি বিরাট দেহের মালিক ঠাকুর্দাকে কল্পনার চোখে দেখতে চেষ্টা করে পিনাকী।

ঠাকুরর্দা অল্প বয়েসেই মারা গেলেন কেন? রোগা রামচরণ ঠাকুর তো এখনো আশী বছর পার হয়ে বেঁচে আছেন!

রাশি রাশি কোঁকড়ানো চুল ছড়িয়ে আছে মায়ের মুখের চারিপাশে। কিছুটা পড়েছিল মাটির উপর। পিনাকী এগিয়ে আসে। আলগোছে তুলে রাখবার চেষ্টা করে মায়ের কানের পাশ দিয়ে। পিনাকীর আঙুলের স্পর্শে রমা দেবীর তন্দ্রা ভেঙে যায়। একটু অপ্রস্তুত হয় পিনাকী।

ঘুমটা ভাঙ্গানো উচিত হয় নি ; মায়ের পা ছুঁয়ে প্রণাম করবার জন্য হাত বাড়ায় পিনাকী। বাবার কাছে শিক্ষা, অনেকদিনের পর দেখা হলে গুরুজনকে প্রণাম করতে হয়। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী—দীনুমামার বইতে লেখা আছে।

ঠাকুরমা হাঁ-হাঁ করে ওঠেন, করিস কি, করিস কি! শোয়া মানুষ, রোগা মানুষ, প্রণাম করতে নেই। অমঙ্গল হয়।

অমঙ্গল হয়! অমঙ্গল মানে মৃত্যু নয় তো? পিনাকীর বুকটা ছাঁৎ করে ওঠে। মৃত্যু, মৃত্যুর ছায়া কি দেখা যাচ্ছে মায়ের চোখের কোণের কালিমায়, পাণ্ডুর ওষ্ঠে, ক্লিষ্ট ভ্রূর আকুঞ্চনে? মৃত্যু, মৃত্যুর প্রকৃত অর্থ কি?

কিছু দিন আগেও মা ডাকতো, পিনাকী, পিনু, সোনামণি, যাদুমণি, লক্ষ্মী আমার, খেয়ে নাও দুধটুকু।···লালখাতা কিনে দেব, 'আরো গল্প' কিনে দেব, কলকাতা থেকে ট্রামগাড়ি আনিয়ে দেব, আলুর পুতুল, ডলি পুতুল, মস্ত বড়, খেয়ে নাও। এখন আর ডলি পুতুল পাবার জন্য লালায়িত নয় পিনাকী। 'আরো গল্প' নীলিমাদের বাড়ী থেকে আনিয়ে পড়ে ফেলেছে সে; কিন্তু···কিন্তু··· বিবর্ণমুখে পিনাকী ভাবে অক্ষয় পোদ্দারের বউ-এর মতন মাও কি শেষে মিলিয়ে যাবে আকাশে? সবাইকে ছেড়ে চলে যাবে মা, আর দেখা যাবে না কোন দিন?···

মায়ের সঙ্গে ভাব ছিল পোদ্দারের বউ-এর। পোদ্দার নৌকো বেয়ে নিয়ে আসতো বউকে এপারে, বলতো—ও কলকেতার ঠাউরদি, আসেন, বাইরি আসেন, ছ্যাহেনশেন কিভারে আনিছি। এট্টু দেহায় শোনায়, বুঝোয় দেন দেহি।

বাড়ীতে ননদ শাশুড়ী কেউ নেই, একা অক্ষয় পোদ্দার, আর তার নববিবাহিতা তের-চোদ্দ বছরের ফুটফুটে বউ। পোদ্দারের আশা, পিনাকীর মায়ের সংস্পর্শে এসে যদি বউটি চালাক-চতুর হয়, বুদ্ধিশুদ্ধি বাড়ে, হাজার হোক কোলকাতায় জন্ম, পাড়াগাঁয়ের বউদের চেয়ে অনেক বেশী খোঁজ-খবর রাখেন। আরও কিছু উদ্দেশ্য ছিল হয়তো পোদ্দারের মনে। প্রসাধনের ব্যাপারে অনেক কিছু জানা আছে শহরের মেয়ের। ফর্সা, টুকটুকে বউ, এমন বউ—সাহা, পোদ্দার, কুণ্ডু, তিলি, কারুর বাড়ীতেই নেই, কেউ স্মরণ করতে পারে না, ছিল কোন দিন।

পোদ্দারের বাড়ীর উত্তরে কাশবন। কাশবনের আরো খানিকটা দূরে নদীর বাঁক ঘুরে গিয়েছে। সেই বাঁকের মাথায় শ্মশান। এ অঞ্চলের শ্মশান। মাঝে মাঝে মৃত দেহ পুড়তে দেখা যায়। পিনাকীদের ঘাট থেকেই দেখা যায়—ভস্মীভূত দেহ ধোঁয়ার কুণ্ডলী হয়ে উড়ে চলেছে আকাশে। অনেকক্ষণ ধরে যদি ধোঁয়া থাকে তাহলে বুঝতে হবে এখনো আধিভৌতিক দেহের আকর্ষণ রয়ে গিয়েছে পৃথিবীর উপর।

অক্ষয় পোদ্দারের দৃঢ় বিশ্বাস, তার বউ মরে স্বর্গে গিয়েছে। মণ্ডপ-ঘরে একদিন তামাক টানতে টানতে বলেছিল পোদ্দার, পিনাকী ঘরের কোণে মোড়ায় বসে শুনতে পেয়েছিল সব কথা।—জানেন ঠাউরদা, রাত্তির হলিই তেনারে দেহে থাহি।

ব্রজঠাকুরের গা শিরশির করে ওঠে, সর্বেশ্বরও গম্ভীর মুখে শুনে যান।

একখানা শাদা শাড়ী পরে আসে পোদ্দারের স্ত্রী। তেঁতুলগাছের উপর দিয়ে রথে চড়ে আসে স্বর্গ থেকে।

—কি কবো ঠাউরদা, সহালে উটে দেহি উঠনে আর ধূলো নেই, বাড়ী, ঘর দুয়োর, পাচদুয়োর সব যেন গোমাই দিয়ে ল্যাপা। হইছিল কি ব্যাপারডা তাহলি খুলেই বলি : কাল রাত্তিরি আ'সে দাঁড়ায় ছেলেন রান্নাঘরের দরজার গোড়ায়। কলেন, ভালই আছি, সুহে আছি, দুখ্খু যা তোমার জন্তি। তুমি আর এট্টা দেহে-শুনে বিয়া করো।…সর্বেশ্বর ভুড়ুং ভুড়ুং তামাক টানেন, কোনো উত্তর দেন না। পিনাকীর মনে বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত চিন্তার ভিড়। অস্পষ্টভাবে পিনাকীর মনে পড়ে কোথায় যেন দিদিমার বেতের ঝাঁপি থেকে কি একটা বই বের করে সে পড়েছিল একদিন। পাপপুণ্যের ফলাফল, পূর্বজন্ম, পরজন্মের চমকদার কাহিনী, অনেক তত্ত্বকথা লেখা ছিল সেই গল্পে। সাবিত্রীব্রত পালন করে চলেছেন বৎসরের পর বৎসর ঠাকুরমা। আশা, পরজন্মে স্বামীর আগেই যেন যেতে পারেন তিনি। পুণ্যবতী মা—মায়ের কপালে বৈধব্য নেই, কুষ্ঠীতে লেখা আছে, দিদিমার কাছে শুনেছে পিনাকী।…

না, না, মাকে ছেড়ে পিনাকী একদিনও থাকতে পারবে না। মায়ের সঙ্গে সেও স্বর্গে যাবে। ভগবান মধুসূদন হরি, জগন্নাথ, গোবিন্দদেব, নারায়ণ—মাকে ভাল করে দাও।…

কায়মনোবাক্যে ডাকলেই ভগবান সাড়া দেন, অনুরোধ রক্ষা করেন। কি করে কায়মনোবাক্যে ডাকা যায় ভগবানকে? কে শিখিয়ে দেবে?…

ভগবান যদি আদেশ দেন—যমের সাধ্য নেই মাকে কেড়ে নিয়ে যাবে পাতালে। কাতর নয়নে পিনাকী দরজার ফাঁক দিয়ে আকাশের দিকে দৃষ্টি ফেরায়।

আকাশ, মহাশূন্যের উপরেই তো ভগবানের অবস্থান।

কি মন্ত্রে ভগবানকে ডাকলে ব্যাধি থেকে মুক্তি পাবে মা? আবার হাসি ফুটবে মায়ের মুখে? মা, মায়ের কি সুন্দর চেহারা ছিল, কিন্তু—

একি মূর্তি হয়েছে আজ!

শুধু হাড় ক'খানি।

শরীরে আর কিছুই নেই।

মায়ের চোখের ইঙ্গিতে পিনাকী কাছে এসে বুক ঘেঁষে বসে। রমা দেবী অতিকষ্টে শীর্ণ বাহু তুলে পিনাকীর মুখের উপর হাত বুলিয়ে দেখে নেন। যেমনটি ছিল তেমনটি কি ফিরে এসেছে ?

বয়স বেড়েছে কৈ ?

…পিনু—আঁতুড়ঘরের ছোট্ট সেই পিনু এইতো সেদিনকার কথা, কি বৃষ্টি হয়েছিল সেদিন !…

আকাশের ক্রন্দনের মধ্যে যে শিশুর জন্ম, সেই শিশুর ভবিষ্যৎ কি উজ্জ্বল সূর্যের কিরণে ভরে উঠবে ? অথবা কেবলি মেঘে মেঘে ঠোকাঠুকি, বিদ্যুৎ ঝল্‌কে ঝল্‌সে যাবে আকাশ ? শুধু বৃষ্টি, বৃষ্টির পর বৃষ্টি—স্বর্ণময়ী লিখেছে শিলং থেকে, চেরাপুঞ্জী বেড়াতে গিয়েছিল, বর্ণনা করে লিখেছে। পুঞ্জীভূত মেঘ, মেঘের উপর মেঘ, বৃষ্টি লেগেই আছে। কাকীমার কাছে এখনো নিয়মিত চিঠি লেখে স্বর্ণময়ী। মাসের মধ্যে একবার অন্ততঃ একটা চিঠি লিখে সে সংবাদ নেয়। পিনাকী কেমন আছে, পিনাকী কি করছে, পিনাকীর কাছে চিঠি লিখলে সে চিঠির উত্তর দিতে ভয়ানক দেরি করে কেন, কাকীমা তুমি কেন নিজ থেকে চিঠির উত্তর লেখ না, তিনবার চারবার চিঠি লেখার পর কয়েক লাইন লিখে ছেড়ে দাও।…তোমরা আমাকে ভুলে গেছ একেবারে ইত্যাদি, ইত্যাদি।… মেয়েটার এখনো ছেলেমেয়ে কিছুই হ'ল না—রমা দেবী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন শুয়ে শুয়ে …কি জানি কেন ! …মেয়েটা তাই পিনুকে কাছে রাখতে চায়। এতদিনে বুঝলাম।…

—পিনু, তুই কিছু খাস নি, আমি বেশ বুঝতে পারছি, স্নান করে খেয়ে নাওগে যাও। তোর সন্দেশদি তোর জন্যে ফেনভাত চাপিয়েছেন, বলে দিয়েছিলাম, আর দেরি করিস নি।

পিনাকী মায়ের স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে ভরসা পায়। দুঃস্বপ্নের মতন সমস্ত দুশ্চিন্তা মিলিয়ে যায় অকস্মাৎ। উৎসাহের সঙ্গে বলে, মা, মা, জান তোমার জন্যে কি এনেছি ? দাঁড়াও দেখাচ্ছি। ..

চঞ্চল বালক লাফিয়ে চলে।

উঠন পার হয়ে যায় এক নিঃশ্বাসে।

বইয়ের ওজনে ভারী বোঁচকা। বুক সমান উঁচু বারান্দা। বৃষ্টির জল জমেছিল চালের নিচে। পিছলে পড়ে যায় পিনাকী। বোঁচকার বাঁধন আগে থেকেই আলগা হয়ে গিয়েছিল—রাস্তায় আসতে আসতে ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত জিনিস। বই, খাতা, পেন্সিল, প্যাণ্ট, জামা, স্কেল, মায়ের জন্য আনা শাড়ী এক জোড়া। আরো টুকিটাকি কত কি সংগ্রহ করে এনেছে পিনাকী। রুপোর কৌটাটা সিঁদুর-ভরা, সাধনা মাসী দিয়েছে মায়ের জন্য। ডালা খুলে পড়ে যায় সিঁদুর, সাড়ীর উপর।

ভিজে উঠন লাল হয়ে ওঠে।…

…"দাঁড়াও, আমি গুছিয়ে দিচ্ছি।' মিষ্টি স্বর ভেসে আসে কানে।

পিনাকী ঘাড় ফিরিয়ে দেখে।

বেলা, বেলা কখন এল ? কোন্ পথ দিয়ে ?

—খুব লেগেছে, না পিনুদা ?

—না রে, বেশী লাগে নি।

অবাক হয়ে পিনাকী দেখে—বেলা, সেই ছোট্ট বেলা, হঠাৎ কি করে অত ঢ্যাঙা হয়ে গেল ?

বোসেদের বাড়ীর বেলা বলে, পিনুদা, তোমাকে সাহেবের মতন ফর্সা দেখাচ্ছে।

চলতে চলতে উত্তর দেয় পিনাকী—যাঃ, তুই ভারী বোকা। সাহেবরা আমার চেয়ে অনেক বেশী ফর্সা।

নদীর তীরে আসশেওড়ার বন। লোকে বলে আষ্টেল বন। আষ্টেলের ডাল ভেঙ্গে দাঁতন করে গাঁয়ের লোক। নিমের দাঁতনের চেয়েও ভাল ব্রাশের কাজ হয় আষ্টেল ডালে। লাল লাল ছোট ছোট ফল, পাকলে খায় ছেলেমেয়েরা।

লক্ষ্মী চারা গাছের গুঁড়ি পড়ে আছে, ছনুরাম কুড়ুল দিয়ে চেলা করে। মাটি খুঁড়ে উঠিয়েছে গুঁড়িটাকে। তাতে আর একটা আমগাছের চারা লাগানো হবে। কলম বেঁধে রেখেছে রতিকান্ত। মালদাই গাছের ডালে খড় দিয়ে ঢাকা মাটির প্রলেপ। এর মধ্যেই প্রলেপকে আঁকড়ে ধরেছে নতুন শিকড়। শাখার মধ্যেও প্রাণ, প্রশাখার বীজ। প্রাণ হতে প্রাণ, নবজীবনের সঞ্চার। খড় দিয়ে ঢাকা কলমের ছোট্ট শিকড়গুলি টেনে নেয় পিনাকীর মন।···

শেফালী গাছের তলাটা কি সুন্দর, পরিষ্কার—ঝাঁট দিয়েছে কে ? বেলা বলে, জানো পিনুদা, জ্যেঠিমা একদিন স্বপ্নে দেখেছিলেন তুমি একজন জটাজুটধারী সন্ন্যেসীর সঙ্গে কথা বলছ। ঐখানটায় বসে, এমন সময় একটা সাপ, মস্ত বড় সাপ, মাথায় মণি, বেরিয়ে এলো গর্ত থেকে, এসে মাথা দোলাতে লাগলো। জ্যেঠিমা ভাবলেন বুঝি তোমাকে ছোবল দিতে যাচ্ছে। চীৎকার করে উঠলেন। যেই না চীৎকার করেছেন, সাপটা অমনি গজরাতে শুরু ক'রল। স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল।

স্বপ্ন, ভোরের স্বপ্ন—ভাঙ্গবার পর যদি আর ঘুমোনো না যায়, তা'হলে স্বপ্ন সত্যি হয়। স্বপ্ন দেখেছে পিনাকী—সে আর বেলা হেঁটে চলেছে নদীর ধার দিয়ে মহাকুমা শহর লক্ষ্য ক'রে। কেন যে যাচ্ছে তারা, তার কোন মানে নেই। শুধু মনে আছে চলছে তারা, শুধু হেঁটেই চলেছে। দেওয়ান-মারোর শুকনো খাল পার হ'য়ে যেই মুচিপাড়া পর্যন্ত গিয়েছে তারা, অমনি কানে গেল ঢাকঢোল বাজিয়ে পুজো হচ্ছে। পুজো করছে কারা ? অসময়ে দুর্গাপুজো ? ওমা, একি, এ যে ঘোনা মুচি—আরতি করছে···মা দুর্গার প্রতিমার সামনে। কোথায় মা দুর্গা! নিমেষের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন! পিনাকীর মা। মা-ই কি তবে দুর্গতিনাশিনী ? ঘোনা মুচি ঘণ্টা নাড়া বন্ধ রেখে বলে পিনাকীর মায়ের দয়াতেই তার রুগ্ন, মৃতপ্রায় ছেলে বেঁচে উঠেছে।

—স্বপ্ন—কি আশ্চর্য! ঘোনা মুচির ছেলে—তোমাকে একটা সুন্দর সাপ-মুখো বেতের লাঠি উপহার দিয়েছিল, মনে নেই?—বেলা মিটিমিটি হাসে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে আছে—বল্‌না, কি বল্‌ছিলি।

—ওর নাম মানু। মানু বেঁচে গেল শুধু জ্যেঠিমার জন্যে।

—কি হয়েছিল রে?

—সে কি! তোমরা কেউ জানো না? এতবড় কাণ্ড হয়ে গেল, কোলকাতায় কেউ তোমরা শোনো নি! ঘোনা মুচি তোমাদের গোলা থেকে ধান চুরি করছিল, ধরে ফেলল ধলা চৌকিদার—কি মার! জ্যেঠিমা না থাকলে মার খেয়েই মরে যেতো ঘোনা। কি রোগা চেহারা, ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে একটাও ধামা বানাতে পারে নি; ছেলের অসুখ, তাই চুরি করতে এসেছিল। ছেড়ে দাও ওকে—বললেন জ্যেঠিমা।

পিনাকী চুপ ক'রে শোনে, কোনো কথা বলে না। বেলা বলে—জানো পিনুদা, জ্যেঠিমা গলার হারটা বেচে দিয়েছেন। হাতে টাকা ছিল না তাই। মানুর ডবল নিউমোনিয়া। বড় ডাক্তার এসেছিলেন মহকুমা থেকে। ঘোনা মুচির কি কান্না, জ্যেঠিমার পায়ের উপর মাথা কুটেছিল। কেবল বলছিল—মা বাঁচান আমার ছেলেকে বাঁচান। জ্যেঠামশায় বাড়ী ছিলেন না সেদিন। আমি এসেছিলাম কুলের আচার দিতে জ্যেঠিমাকে।···

বেলা মনোনিবেশ সহকারে উঠনের কোণায় রাখা গোবরগোলা-ভর্তি ভাঙ্গা হাঁড়িটা তুলে নেয়। ঢেলে দেয় শেফালীগাছের তলায়। গন্ধরাজের ঝাড়ের নিচেই পড়েছিল মুড়ো ঝাঁটা। ঝাটা হাতে কোমর বেঁকিয়ে দাঁড়ায় বেলা।

—গোবর গোলা নষ্ট করলি! এখুনি সুখীর মা এসে চীৎকার করবে।

বেলা ভৎর্সনায় কান না দিয়ে বলে চলে—আরো অনেক ব্যাপার ঘটে গিয়েছে। তোমার ঠাকুর মার কি রাগ! তোমার বাবা কিন্তু কিছু বলেন নি, শুধু মুখ গম্ভীর করেছিলেন।

—কি ব্যাপার, খুলে বল্ না—তুই কেবল কথা বাড়াস।

—হু, আমি কথা বাড়াই! আর তুমি খুব সোজা কথা বল—তোমার বাবাই তো বলেন পিনাকী কথার ইস্টীমার, খালি চাকা ঘুরছে, আর মুখের নাল কাটছে।

—খুব ইয়ারকি দিতে শিখেছ, না। এই বুঝি তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি হচ্ছে। দাঁড়াও বলে দেব কাকীমাকে।

পিনাকীর অদ্ভুত মুখভঙ্গি ও ভাষার গাম্ভীর্যে বেলা খিলখিল করে হেসে ওঠে।

হি, হি, হি, কিছুতেই সে হাসি থামাতে পারে না। পিনাকী অবশেষে বিরক্ত হয়ে বলে—আমি চললাম। আমার অনেক কাজ আছে। তুমি হাসো, যত পারো হাসো।

অনেক কাজ, কি কাজ? পিনুদা, তুমি ভারী ই'য়ে—যাকে বলে, ঐ যে ছনুরাম কি যেন, বলে?···

—কি যেন বলে!···পিনাকী মুখভ্যাংচি দেয়। বলে—মারব এক গাঁট্টা, তখন বুঝতে পারবি!

পিনাকীর রাগ দেখে বেলার ছেলেমানুষী আরো বেড়ে চলে। পিনাকী তাড়া ক'রে যায় বেলাকে ধরতে। বেলা ছুটে যায় খানিকটা, তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে ধরা দেয়। পূর্বের মতন মন আর নেই পিনাকীর। দোলানো বেণী ধরে টান দিতেই বেলা মুখ ঘুরিয়ে পিনাকীর দিকে চেয়ে হেসে ফেলে আবার। বলে—বলবো না, কিছুতেই বলবো না। আগে বলো কেন চিঠির উত্তর দাও নি—কেন—কেন? তোমার উপর এমন রাগ হয়েছিল তখন। পিছলে পড়ে গেলে তাই, না হ'লে···

না হলে কি?

(আগামী বারে শেষ হবে)

এই সংসার স্বপ্ন নয়

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

উদ্যোগেতেই ভাগ্য গঠন
ভাগ্য নিজে বস্তু নয়,
আশা ও উৎসাহের কর্ম
সফল হবেই নেইকো ভয়।
অলস যারা এ সংসারে
ভাগ্য-দোহাই দেয় তারাই,
উৎসাহীরা কাজ করে যায়
দোহাই দেওয়ার নেই বালাই।

আশা ও বিশ্বাসের সাথে
কর্ম করো সর্বদা,
বৃথা সময় নষ্ট করাই
এই জীবনের মূর্খতা।
কর্ম করো সুনাম লভো
এই সংসার স্বপ্ন নয়,
মানুষ সত্য, জগত সত্য
সত্য ব্যাপ্ত বিশ্বময়।

এলিফ্যাণ্টা গুহা

শ্রীউত্তরা সেন

বোম্বাইতে যাঁরাই আসেন, তাঁরা সকলেই অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের মাঝখানে এলিফ্যাণ্টা গুহাও দেখতে যান। আমরাও আর সকল দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখে, একদিন এলিফ্যাণ্টার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমালাম।

বোম্বাইকে ঘিরে সমুদ্রের চারপাশে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ দূর থেকে আবছায়ার মত দেখা যায়। এরই একটা দ্বীপের পাহাড়ের ভিতর এলিফ্যাণ্টার অতুল সৌন্দর্যরাজি লুকিয়ে আছে।

প্রায় দেড় হাজার বছর আগের সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর এই গুহাগুলিতে এখনকার হিন্দুদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ছাপ ফুটে উঠেছে।

নির্দিষ্ট দিনে আমরা 'গেটওয়ে অফ ইণ্ডিয়া' থেকে একটা লঞ্চ ভাড়া করে এলিফ্যাণ্টার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমালাম। সেদিন আকাশ ছিল ঘন নীল। আকাশের সেই ইন্দ্রনীল রঙ সমুদ্রের বুকেও ফেলেছিল নীলাভ ছায়া। দূরে দেখা যাচ্ছিল ধূসর দ্বীপগুলিকে। আমাদের লঞ্চ ঝিক্‌ঝিক্ করে জল কেটে ঐ ধূসর দ্বীপগুলির মধ্যে একটা দ্বীপের উদ্দেশ্যে চলতে লাগল।

দেখতে দেখতে সমুদ্রের ঢেউ-এর দোলায় দুলতে দুলতে এসে পৌছলাম এলিফ্যাণ্টা দ্বীপে। আমাদের লঞ্চ এসে তীরে ভিড়ল। আমরা একে একে নেমে পড়লাম। নির্জন দ্বীপের তীরের উপর সমুদ্রের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে। সামনে গাছপালায় ঢাকা এলিফ্যাণ্টা পাহাড়। আমরা পাহাড় বেয়ে উঠে টিকিট ঘরের কাছে গিয়ে টিকিট কিনে ভিতরে ঢুকলাম।

ভিতরে ঢুকেই মনে হ'ল যেন শত শত যুগ পিছিয়ে, ইতিহাসের এক প্রাচীন যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতির মাঝে এসে পৌচেছি। সামনে আমাদের বিরাট চত্বর দু'পাশে তার বিরাট দুটি স্তম্ভ। ঐতিহাসিক স্মৃতিমণ্ডিত সেই চত্বর হয়ে গুহায় ঢুকলাম। গুহার সামনেই রয়েছে শিবের নটরাজ মূর্তি। সেই কারুকার্য খোদিত মূর্তিটিকে দেখলে জীবন্ত বলে ভ্রম হয়।

গুহার পর গুহা। আর সেই সব গুহায় খোদাই করা হয়েছে দেবাদিদেব শিবের জীবনলীলার চিত্রাবলী। সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর সেই মূর্তিগুলি তখনকার দিনের, পোশাক-পরিচ্ছদ, অলঙ্কার ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা দেয়।

সেই বিরাট গুহাগুলির দেয়ালগাত্রে রয়েছে নানা মূর্তি। কোথাও রয়েছে ধ্যানমগ্ন শিব,

আবার কোথাও রয়েছে রুদ্রমূর্তি শিব। শিবের অসুর বধ, হর-পার্বতীর বিবাহ ইত্যাদি নানা বিষয়ের বৈচিত্র্যপূর্ণ মূর্তিগুলি দেখলে অভিভূত হয়ে পড়তে হয়।

প্রতিটি মূর্তির অপূর্ব কারুকার্য, লীলায়িত ভঙ্গী ও মুখের ভাবে তাদের প্রস্তরমূর্তি বলে মনে হয় না। স্থানে স্থানে বিরাট মৌনকায় শিবলিঙ্গকে ঘিরে রয়েছে সুন্দরী পাষাণকন্যারা। গুহাগুলি দেখতে দেখতে মনে হ'ল, যেন রূপকথায় পড়া ঘুমন্তপুরীর মত গুহাগুলি যাদুমন্ত্রের ছোঁয়ায় পাষাণকায় নর-নারীদের নিয়ে নিঝুম হয়ে রয়েছে।

আশেপাশে ছোট গুহাগুলি দেখার পর আমরা একটা মস্তবড় গুহার ভিতর ঢুকলাম। গুহার মাঝখানে আছে বিরাট এক ত্রিমূর্তি। মহেশ্বরের তিনটি ভাবের প্রতীক স্বরূপ এই মূর্তিটি। স্রষ্টা, পালক ও সংহারক। এই বিরাট মূর্তিটির প্রত্যেকটি মুখাবয়বের রেখায় ফুটে উঠেছে ভাবের বিচিত্র খেলা।

আমাদের সঙ্গে একদল চেক্ পুতুলনাচের দল সেই সময় এসেছিলেন এখানে। তাঁরা মূর্তিটির ছবি তুলে নিলেন। গাইড তাঁদের মূর্তিটির বিষয় ইংরাজিতে বর্ণনা করে শোনাল।

এইসব দেখতে দেখতে মনে হ'ল, এখুনি বুঝি শঙ্খ ঘণ্টা বেজে উঠবে, আর পুরোহিতের উদাত্ত মন্ত্রপাঠের সঙ্গে শুরু হবে দেবাদিদেব শিবের আরতি। একটু অপেক্ষা করলেই সেই আরতি দেখা যাবে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অটুট এই মূর্তিগুলির শিল্পকার্য যে অতুলনীয় তাতে আর সন্দেহ নেই। সম্ভবতঃ গুপ্তযুগের পরে রাষ্ট্রকূট রাজাদের সময় এই মূর্তিগুলি খোদাই করা হয়। কালের উত্থানপতনের আবর্তে সেই রাজারা হারিয়ে গেছে। কিন্তু তাদের স্মৃতি অক্ষয় হয়ে আছে এক নির্জন দ্বীপের গুহাগাত্রে।

সন্ধ্যা হয়ে আসায় কিছু আর দেখা যাচ্ছিল না। আমরা বাইরে এসে দাঁড়ালাম। সূর্যদেব তখন সারা আকাশে লাল আবীর ছড়িয়ে বিদায় নিচ্ছেন। সমুদ্রের ঢেউ-এর দাপাদাপিতে, গাছের পাতার মৃদু গুঞ্জরণে চলেছে তাঁর বিদায়-উৎসবের সমারোহ।

ক্রমে অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসাতে আমরা আবার লঞ্চে চেপে বোম্বাই-এর উদ্দেশ্যে রওনা হ'লাম। পিছনে পাহাড়ের বুকে হারিয়ে যেতে লাগল এলিফ্যাণ্টা গুহা, আর সামনে বোম্বাই-এর কূলরেখার সারবন্দী আলোগুলি ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। 'গেটওয়ে অফ ইণ্ডিয়ার' উঁচু মিনারগুলি মনে হ'ল আমাদের আহ্বান করছে। মনে হ'ল কালের গুহা-সমুদ্র পার হয়ে আমরা অতীত যুগ থেকে বর্তমান যুগে এবার ফিরে এলাম।

পশ্চিমের-প্রয়ান্ধকার আকাশে মিশে যায়
একাদশীর চাঁদ।
পূর্বের রক্তিম দিগন্তে লাগে
প্রভাত-রবির আভাস।
ব্রাহ্মমুহূর্ত,—
জেগে ওঠে সামগান তপোবনে
শিপ্রানদী তটে।
প্রভাতে স্নিগ্ধ-পবনের দীর্ঘশ্বাসে
আন্দোলিত হয় তরুশাখা।
হরিণশাবক চোখ মেলে চায়,
পাপিয়া, দোয়েল শিষ দেয় মধুর সুতীক্ষ্ণ স্বরে।
তপোবনে আসে প্রভাত।

* * *

প্রভাত হয় অনার্য পল্লীতে।
মাতা জনার কোলে চোখ মেলে চায়
শিশু-কানাই।
শিশু-রবির কিরণ লাগে শিশু-কানাই-এর চোখে।
তারও প্রভাত হয়।
তপোবন-ধেনুগুলি নিয়ে
শিশির-ভেজা পথে নামে সে।
তখন তপোবনে গুরুকে কেন্দ্র করে
ঋষিবালকেরা গ্রহণ করছে
নূতন দিনের নূতন পাঠ।
কচি-কণ্ঠের সুমিষ্ট বেদ আবৃত্তি
দোলা লাগায়—
কচি-কিশলয়পূর্ণ তমালের শাখায়।

* * *

বৃক্ষতলে আনমনে বসে থাকে কানাই,
কোলের বাঁশী থাকে সুরহারা—মূক।
আকাশে তপনদেবের অবস্থান
উচ্চ থেকে উচ্চতর হয়।

বেদপাঠ হয় স্তব্ধ।
তবু বুঝি সেই সুরের অনুরণন চলে
শিশু-কানাই-এর হৃদয় মথিত ক'রে।
এক সময়ে চেয়ে দেখে—
কাজলী গাই তার গভীর কালো—
ব্যথাতুর নয়নে চেয়ে আছে তার পানে।
কানাই জড়িয়ে ধরে কাজরীর কণ্ঠ
দুই ব্যথাতুর হৃদয় বুঝি মিশে
এক হয়ে যায়।

* * *

সাঁঝের আলোয় থেমে যায় মাঠের বাঁশী।
ঘরে ফেরে সব রাখাল বালক।
ছুটে এসে জনা কোলে তুলে নেন
কানাইকে—সস্নেহে।
'মাগো'—উদ্বেল, অভিমানাহত, কাতর কণ্ঠ
ধ্বনিত হয়—'আরও কত বড় হলে
আমি পড়ব বেদ?'
সন্ধ্যার আচ্ছন্ন আলোক
চাপা দেয় মাতার অশ্রুপূর্ণ আঁখি।
সমস্ত হৃদয় বলে ওঠে—
ওরে বাছা! তুই যে অনার্য সন্তান।
নেই যে তোর বেদ পাঠের অধিকার।
সেকথা কি করে বোঝাই তোকে!
কেঁদে ওঠে সমস্ত মাতৃহৃদয়।
আজই হোক এই কঠোর সত্যের সাথে পরিচয়।
বালককে বুকে রেখে মাতা তাকে
বোঝান সব কথা।
স্তব্ধ বালক—
নীরব বিস্ময়ে শোনে,
তার অবাক চোখের ভাষা পড়েন শুধু মা!

* * *

কালের স্রোতের তরঙ্গে ভেসে যায়
অনার্য-পল্লীর নিস্তরঙ্গ দিনগুলি।
শিশু-কানাই পরিণত হয় বালকে,
বালক থেকে কিশোরে।
তার মনের সুপ্ত কামনা
কালের স্রোতে হয় না লুপ্ত,
উঠে ক্রমশঃ বেড়ে, হয় বলবতী।
শ্রুতিধর বালক—
দীর্ঘদিনের শ্রবণের ফলে
সমগ্র বেদ করে অধিগত।

* * *

এক স্নিগ্ধ নির্জন দ্বিপ্রহর!
শিপ্রা নদীর, পড়ন্ত রৌদ্রের
উজ্জ্বল আভা বিকীর্ণ তটে,
ছায়াচ্ছন্ন তরুমূলে অর্ধশায়িত কানাই,
আপন মনে করে বেদ আবৃত্তি।
ঘুঘুর ক্রন্দন বুঝি স্তব্ধ হয়
তার উদাত্ত আবৃত্তিতে।
প্রান্তর পরিক্রমণরত
মহাতপা, মার্তণ্ডতেজা মুনী কৌশিক
সহসা শুনলেন তার দীপ্ত উদাস স্বর।
আকৃষ্ট হয়ে এলেন তরুতলে,
জিজ্ঞাসিলেন—'কে তুমি বালক'?

তন্ময়তা ছিন্ন হয়,
চকিতে মুখ তোলে কানাই।
'দেব!' নতজানু হয়ে প্রণাম জানায় তাঁকে।
'নির্জন মধ্যাহ্নে নদী-তীরে বেদপাঠে রত
কে তুমি?'

'আমি জনা-তনয়, অনার্যবালক, কানাই, দেব।'
'অনার্য!' শিহরে উঠেন ঋষি কৌশিক।
চক্ষে জ্বলে অবিশ্বাসের অগ্নি।
'এ অসম্ভব! কে তোমায় দিল এই
পবিত্র বেদ-মন্ত্র?'

'আপনি দেব।'
'আমি! তুমি কি বাতুল?'
'ব্রাহ্মমুহূর্তে তপোবনছায়ে
আপনি দিতেন পাঠ ঋষি বালকদের',
গাঢ় হয়ে আসে তার স্বর—'দূরে—
অনার্য আমি একাগ্রচিত্তে শুনতেম
সেই পবিত্র বেদমন্ত্র।
এইরূপে সমগ্র বেদ আজ আমার অধীত!'
'পাষণ্ড, অনার্য-তনয়! এতদূর স্পর্ধা!
জান না এর ফল!'···
ক্রোধে, বিস্ময়ে সর্বদেহে ঋষির
কাঁপন লাগে।

'জান এর শাস্তি! তবু-তবু আমি
তোমায় ক্ষমা প্রদর্শন করছি।
প্রতিজ্ঞা কর, জীবনে আর এ পবিত্র মন্ত্র
উচ্চারণে কলুষিত করবেনা—বেদ।'

'তা হয় না প্রভু!' নির্ভীক প্রতিবাদের
ভাষা তার বেদনা-জর্জরিত
বক্ষ হতে অগ্নুৎপাতের মত ছুটে আসে:
'সে প্রতিজ্ঞা করা আমার পক্ষে অসম্ভব।
বেদ কখনও কলুষিত হয় না।

আর্য-অনার্য উভয়ই তো ঈশ্বরের সৃষ্ট,
তবে ভেদাভেদ কেন হবে প্রভু!
অনার্য পাবে না কেন বেদপাঠের অধিকার?'

'স্তব্ধ হও মূঢ়!' গর্জন করে ওঠেন
মহাতপা ঋষি।
'দুর্বিনীত বালক, ক্ষমার যোগ্য-পাত্র নও তুমি।
শাস্তিই তোমার প্রয়োজন।'
তেজবিকীর্ণ ক'রে—সদর্পে স্থানত্যাগ করেন ঋষি।

* * *

গৃহে দুঃস্বপ্নে নিদ্রাভঙ্গ হয় জনার,
দক্ষিণ অঙ্গ উঠে কেঁপে, অমঙ্গল
আশঙ্কায় মুখে অঞ্চল চাপা দেন তিনি।

* * *

সায়াহ্নের অস্ত-রবির রাগে
রাঙিয়ে যায় পশ্চিম দিগন্ত।
দুরন্ত হাওয়া ছুটে এসে
উড়িয়ে নিয়ে যায় শুকনো পাতা
আর আধ-ফোটা ফুল।
ধেনু নিয়ে ঘরে ফেরে কানাই।

সংবাদ আসে
পঞ্চায়েৎ বসেছে
কানাই ও মাতা জনার
উপস্থিতি প্রয়োজন।
ভীতা ক্রন্দনরতা মাতা,
কানাই-সহ এলেন পঞ্চায়েতের দ্বারে ;
শুনলেন কানাই-এর অপরাধ—
অনার্যের বেদপাঠ অমার্জনীয় !
পবিত্র বেদমন্ত্র হয়েছে কলুষিত।
ক্ষমা নাই।
উন্মাদিনী মাতা,
প্রত্যেকের পায়ে পায়ে
মাথা কোটেন।
'বিধবার একমাত্র সন্তানকে
এভাবে শাস্তি দিয়ো না গো,
ক্ষমা করো !'
ভাবলেশহীন মুখে ইন্দ্রিয়জয়ী ঋষিরা
বসে থাকেন।
বলেন—'ক্ষমা নেই।'
ঘোষণা হয় শাস্তির—
যে জিহ্বা বেদমন্ত্রকে করেছে
কলুষিত, সেই জিহ্বা, উৎপাটনই—
একমাত্র শাস্তি।
অচৈতন্য জননী ভূমিতল আশ্রয় করেন।

* * *

আর এক ব্রাহ্মমুহূর্ত,
জ্বলে ওঠে লেলিহান চিতা
শিপ্রানদী তটে।
তীরে উপবিষ্ট একটি মাত্র
পাষাণময়ী মূর্তি।
শিপ্রার নীল-জল ভেদ করে উদিত হন
রক্তাম্বর—তপনদেব।
স্তিমিতশিখা চিতার উপরে বর্ষিত হয়
আলোকের আশীর্বাদ—শতধারে।
যার কোন ভেদাভেদ নেই—
আর্যে ও অনার্যে !

মর্ণিং ওয়াক্
শিল্পী : শ্রীসমীর রায় চৌধুরী

কালো চোখো মেয়ে

শ্রীগোপা দত্ত

অনেক দিন, অ-নেক দিন হলো আর কোন খবর জানি না ওর। শুধু মনে পড়ে কালো ভ্রমরের মত চোখ দুটি তুলে বলেছিলো, "ভুলিস না আমাকে।" তারপর রুদ্ধ আবেগে ঠোঁট দুটি একটু কেঁপে উঠেছিলো। আর চোখ দুটো বেয়ে গড়িয়ে পড়েছিল শুধু দুই ফোঁটা জল। আর কিছুই না।

তারপর। তারপর কেটে গেছে অনেক দিন। কোন চিঠিপত্রও পাই নি। ভুলে অবশ্য যাই নি। তবে মনেও রাখি নি তেমন করে।

আজ আবার চমকে উঠলাম একটি কিশোরীর মুখে তারই প্রতিচ্ছবি দেখে। সত্যিই আশ্চর্য। অদ্ভুত মিল। সেই কালো কুচকুচে রং, কোঁকড়া-কোঁকড়া একরাশ চুল আর ভ্রমরের মত দুটি চোখ। এই মেয়েটিও ঠিক তারই মত ভীতত্রস্ত পদে ঘরে ঢুকলো। যদিও সেদিনের সঙ্গে আজ আমার অনেক তফাত। সেদিন আমি ছিলাম একটি তেরো চোদ্দ বছরের কিশোরী আর আজ আমি একজন বিখ্যাত প্রবীণা প্রধান শিক্ষিকা। আমার সুনামের জন্য আজ চারদিকের মেয়েরা পড়তে আসে এই স্কুলে। কিন্তু ওকে দেখে আজও আমার বুকটা সেদিনের মতই দুলে উঠলো। কিন্তু উদ্দেশ্যটা ছিল আমার সম্পূর্ণ অন্য।

মাত্র ফাইন্যাল পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। শুনলাম এইট থেকে নাইনে উঠতে একটি মেয়ে প্রত্যেক বিষয়ে তিন চার পেয়ে ফেল করেছে। মেয়েটি নাকি নোতুন ভাত হয়েছিলো। ও নাকি আবার ফ্রি স্টুডেন্টশিপ চায়। মনটা বড্ড বিগড়ে গেলো। ফেল করে আবার কিনা ফ্রি স্টুডেন্টশিপ চাওয়া! সঙ্গে সঙ্গে ডাকলাম মেয়েটিকে। ইচ্ছে ছিলো খুব ধমকে দেবো। কিন্তু যখন ঘরে ঢুকে কালো ভ্রমরের মত এক জোড়া চোখ আমার মুখের ওপর তুলে দৃঢ় কণ্ঠে বললে, "আমি পড়তে চাই। আমার মা অসুস্থ। বাবা নেই। ফ্রি স্টুডেন্টশিপ না পেলে আমার পড়া হবে না। দয়া করে আমার জীবনটা নষ্ট করবেন না।" আর বলতে পারলো না। গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়লো ঝকঝকে দু' ফোঁটা জল। আমার চোখ দুটোও ঝাপ্‌সা হয়ে এলো। আর মানসপটে ভেসে উঠলো ছাব্বিশ বছর আগের এ ধরনের হুবহু আর একটি ঘটনা। তবে এইটুকু শুধু তফাত—সেদিনকার কালো মেয়ের ছিলো না আজকের মত দৃঢ় কণ্ঠ।

ছাব্বিশ বছর আগে এমনি একটি কালো মেয়ে তার কোঁকড়া কোঁকড়া চুল আর ভ্রমরের মত চোখ দুটো নিয়ে লাজুক পদে ঢুকেছিলো ক্লাশে। এক নজরেই কেন জানি ভালো লেগেছিলো মেয়েটাকে। কেমন যেন একটা শান্ত ভাব ছিলো মেয়েটার। আর আমরা সমস্ত ক্লাশ জুড়ে ছিলাম

এরই বিপরীত। প্রথম দিন থেকেই মেয়েরা শুরু করলো ওর সঙ্গে ঠাট্টা আর ইয়ারকী। কিন্তু ধীরে ধীরে আমার সঙ্গে ওর বন্ধুত্বের বন্ধন হলো দৃঢ়তর। মাঝে মাঝে জোর করে ও আমাকে নিয়ে যেতো ওদের বাড়ীতে। দেখতাম, গরীবের সংসার যেমন হয় ওদেরও ঠিক তেমনি। ওর মা ছিলেন শয্যাগত। ওকেই সংসারের সব কাজকর্ম করতে হতো। কিন্তু স্বভাবটা ছিল ওর ভারী মিষ্টি। এতো কাজকর্ম করেও টুঁ শব্দটি করতো না। কিন্তু স্বভাবের সঙ্গে পড়াশোনার ওর এতোটুকুও মিল ছিল না। ক্লাশে ও একদিনও পড়া পারতো না। এর জন্য প্রত্যেক দিন শাস্তিও ছিলো নিয়ম-বাঁধা। আবার আড়ালে-আবডালে মেয়েদের ঠাট্টা ইয়ারকীও তাকে সহ্য করতে হতো। মাঝে মাঝে চোখের কোণটা চিকচিক করে উঠতো। কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে মুখে মিষ্ট হাসি ফুটিয়ে তুলতো। ফাইন্যাল পরীক্ষা এগিয়ে এলো। ফার্স্ট সেকেণ্ড যদিও কোন দিন হইনি, তবুও সব দিন ভালো ভাবেই পাস করেছি। তাই সুনামটা যাতে নষ্ট না হয় তার জন্য পড়াশোনা যথাসাধ্য শুরু করলাম। ওর সঙ্গে মাঝে মাঝে স্কুলে দেখা হতো। পরীক্ষার আগে প্রায়ই আমি স্কুলে না গিয়ে বাসায় পড়াশোনা করতাম। এরপর পরীক্ষার কিছুদিন আগে স্কুলের ছুটি হয়ে গেলো। ওর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎও হলো একেবারে বন্ধ। ওকে দেখতে আমার খুবই ইচ্ছে করতো, কিন্তু পরীক্ষার আগে বাড়ী থেকে কোথাও যাওয়ার নিষেধ ছিলো। তারপর পরীক্ষাও হয়ে গেলো আর রেজাল্টও আউট হলো। আমি আমার সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেই পাস করেছিলাম, কিন্তু ও পাস করতে পারে নি। মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেলো। পাস করার কোন আনন্দই যেন পেলাম না। বললাম, "পড়বি তো?" বললে, "হ্যাঁ। ফ্রি স্টুডেন্টশিপের জন্য দরখাস্ত করেছি, দেখি কি হয়।" আশার একটু আলো চিকচিক করে উঠলো ওর চোখ দুটিতে। পড়বার ইচ্ছে ছিল ওর খুবই। কিন্তু বই কিনে ও বেতন দিয়ে পড়বার মত ক্ষমতা ছিল না।

তখনও ভালো করে ক্লাশ শুরু হয় নি। আমি আমার ভারী মন নিয়ে নোতুন ক্লাশের জানলায় দাঁড়িয়েছিলাম। একটি মিষ্টি ডাকে চোখ ফিরিয়ে দেখলাম ও দাঁড়িয়ে আছে। বললাম, "কি রে ভর্তি হয়েছিস?" মুখে একটা আশার হাসি ফুটিয়ে তুলে ও বললে, "এখনও হই নি। তবে হেডমিস্ট্রেস ডেকে পাঠিয়েছেন। বোধ হয় ফ্রি স্টুডেন্টশিপটা পেয়ে যাবো।" তারপর আরও একটু হেসে বললে, "এই কথাটাই তোকে বলতে এসেছি।" ও আমাকে জোর করে টেনে হেডমিস্ট্রেসের অফিসরুম পর্যন্ত নিয়ে গেলো। তারপর দেখলাম ঠিক আজকের মেয়েটির মতই আশার হাসি মুখে নিয়ে ভীতত্রস্ত পদে ঘরে গিয়ে ঢুকলো। যখন বেরিয়ে এলো দেখলাম, মুখে আর সেই আশার দীপ্তি নেই। তার বদলে কেমন একটা হতাশার চিহ্ন ফুটে উঠেছে ওর মুখে-চোখে আর দাঁড়ানোর

ভঙ্গিতে। এসেই আমাকে জড়িয়ে ধরলো। বললে, "হলো না রে। সব ভেঙ্গে গেলো।" মনটা মোচড় দিয়ে উঠেছিলো। কেন জানি না হেডমিস্ট্রেসের ওপরই আমার রাগ হয়েছিলো বেশী। মনে হয়েছিলো, কেন তিনি একটু ভেবে দেখলেন না যে তাঁরই ওপর নির্ভর করেছে একটি মেয়ের ভবিষ্যৎ। এই হতাশার ভঙ্গি নিয়ে ফিরে যাওয়ার পর ওর সঙ্গে আর দেখা হয় নি।

মাঝে মাঝে উড়ো খবর পেতাম। শুনেছিলাম ওর মা মারা গেছেন। কাকা এসেছেন ওকে নিয়ে যেতে। একটি বুড়ো পাত্রও নাকি ঠিক আছে। কিন্তু মাথা ঘামাই নি এ-সব নিয়ে। নোতুন ক্লাশ নিয়ে তখন ব্যস্ত ছিলাম। কিন্তু তবু প্রায়ই চোখের সামনে ভেসে উঠতো এক জোড়া কালো ভ্রমরের মত চোখ।

'তোকে দেখতে ভীষণ ইচ্ছে হ'ল তাই ছুটে পালিয়ে এলাম একবার'

সেদিন ছিলো রবিবার। দুপুরে গল্পের বই হাতে নিয়ে একটি লম্বা ঘুম দেবার চেষ্টা করছি, এমন সময় ছোট বোন এসে খবর দিলো একটি মেয়ে নাকি আমাকে ডাকছে। তাড়াতাড়ি বাইরে গিয়ে দেখলাম, দাঁড়িয়ে আছে সে-ই। মনে হলো যেন আরও কালো আর রোগা হয়ে গেছে, চোখ দুটোও যেন বেরিয়ে গেছে অনেকখানি। মাথার চুলগুলো রুক্ষ। বাতাসে উড়ছে। দৌড়ে গিয়ে ওর হাত ধরলাম। বললাম, "ঘরে আয়।" বললো, "না ভাই। বাড়ীর কাউকে বলে আসি নি। এখুনি আবার আমাকে গাড়ী ধরতে হবে।" তারপর হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বললো, "কেন জানি না তোকে দেখতে ভীষণ ইচ্ছে হলো, তাই ছুটে পালিয়ে এলাম একবার।"

আমার বুকের ভেতরটা টনটন করে উঠলো। বললাম, "চলে যাচ্ছিস?" বললে, "হ্যাঁ ভাই।" তারপর শুধু কালো ভ্রমরের মত চোখ দুটো তুলে বলেছিল, "ভুলিস নি আমাকে।" রুদ্ধ আবেগে ঠোঁট দুটো একটু কেঁপে উঠেছিলো। আর চোখ দুটো বেয়ে গড়িয়ে পড়েছিল শুধু দু' ফোঁটা জল। আর কিছুই না। তারপর। তারপর কেটে গেছে অনেক দিন। কোন চিঠিপত্রও পাই নি। ভুলে অবশ্য যাই নি। তবে মনেও রাখি নি তেমন করে। আজ আবার ঠিক তারই মুখের প্রতিচ্ছবি দেখে চমকে উঠলাম। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও দিতে পারিনি মেয়েটাকে ফ্রি ষ্টুডেণ্টশিপ। কারণ একমাত্র ভালো ছাত্রীরাই ছিলো তার অধিকারিণী। তাই ফিরিয়ে দিলাম মেয়েটিকে। বললাম, "হবে না।" শিউরে উঠলো মেয়েটি। ছাব্বিশ বছর আগে ঠিক আমারই মত একজন অক্ষমের কর্কশ স্বরে যেভাবে শিউরে উঠেছিলো আর একটি কচি মন। ঠিক সেদিনের রঙিন স্বপ্নে-ভরা কিশোরী মেয়েটির মত এই মেয়েটিরও মুখে-চোখে ফুটে উঠলো হতাশার ভাব। কিন্তু পরমুহূর্তেই মেয়েটি জোর করে ফিরিয়ে আনলো তার পূর্বের দৃঢ়তা। কিন্তু কালো ভ্রমরের মত চোখ দুটি ভরে গেলো জলে আর সেই জল-ভরা চোখে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে চলে গেলো। মনে হলো, চোখ দুটো যেন আমায় বলে গেলো: "ভুলে গেলি আমাকে?" ছাব্বিশ বছর আগের মতই বুকটা আমার টনটন করে উঠলো। কেন জানি না ছাব্বিশ বছর পরে আজ আবার সেই কালো মেয়ের খবর জানবার জন্যে মনটা উদগ্রীব হয়ে উঠলো। কিন্তু কি করে পাবো ওর সন্ধান? অনেক দিন। অনেক দিন হলো আর কোন খবর জানি না ওর। শুধু মনে পড়ে কালো ভ্রমরের মত চোখ দুটি তুলে বলেছিল, "ভুলিস না আমায়।" তারপর রুদ্ধ আবেগে ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠেছিলো। আর চোখ দুটো বেয়ে গড়িয়ে পড়েছিলো শুধু দু'ফোঁটা জল। আর কিছুই না।

তারপর। তারপর কেটে গেছে অনেক দিন। কেটে যাবেও। চিঠি পত্রও পাই নি, আর পাবোও না। ভুলে অবশ্য যাবো না। তবে মনেও রাখবো না তেমন করে।

প্রার্থনা

শ্রীইলা সরকার

আজি শুক্লা-পঞ্চমীর প্রাতে
সব মনোমন্দির মাঝে—
করি মাগো তব আবাহন।
শ্রদ্ধার্চনা দানি তব
সত্যজ্ঞানে তুমি মাগো
ভ'রে দাও সবাকার মন।

সু-মন্দ্রিত বীণার ঝঙ্কার
খর্ব করুক সব অহঙ্কার,
সাম্যের গাক্ ঐকতান;
দূরে চলে যাক্ সব গ্লানি
সুন্দর সত্যেরে জানি'—
এক হয়ে যাক্ সব প্রাণ।

ব্যর্থ-প্রয়াস

শ্রীঅশোকা দাশগুপ্তা

ভাবুক তো নই—কিন্তু মানুষ তো! মানব হৃদয় তো আছে! তাই মাঝে মাঝে ভাবের তরঙ্গ মনের এক প্রান্ত থেকে, আর এক প্রান্তকে মথিত করে, তার প্রকাশ চায়। কোনো মর্মভেদী ঘটনা দেখে ইচ্ছা করে সুন্দর, সজীব, করুণ একটি রচনা লিখি। কিন্তু কলম হাতে নিয়ে দেখি ঠিক যে গতিতে ভাবের তরঙ্গ মনকে অনুপ্রাণিত করেছিল, ঠিক তার চারগুণ গতিতে তা বিলীন হয়ে গেছে মনের অতলে। মনে হয় মানুষ যেমন কালকে কোনোদিন বশে আনতে পারেনি, ঠিক তেমনি আমিও আমার ভাবকে বশে এনে কোন কবিতা কোনদিন রচনা করতে পারবো না!

কলেজে গিয়ে দেখি Magazine-এ নিজেদের রচনা দেবার জন্য মেয়েরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। নিজের অকৃতকার্যে মনকে ধিক্কৃত করতে করতে স্থির করলাম কবিতা লিখবই। কিন্তু বৃথা ৫-৬ ঘণ্টাব্যাপী অযথা পরিশ্রমের পরে দেখি আমার খাতায় পাঁচটি অমিত্রাক্ষর লাইন—তার না আছে মিল, না আছে ছন্দ, না আছে ভাব—আর সব পাতা সাদা। কালের গতি যেমন মানুষের সৃষ্টিকে ধ্বংস করে অট্টহাস্য করতে থাকে, ঠিক তেমনি আমার মনের সুন্দর ভাবধারা খাতার পাতায় এসে ব্যঙ্গের হাসি হাসতে থাকে মুচকে-মুচকে।…দ্বিতীয় পিরিয়ড ফ্রী ছিল, গঙ্গার ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম। ধীরে ধীরে মরালগতিতে ব'য়ে চলেছে গঙ্গা। সে গতিতে না ছিল উদ্বেগ না ছিল চপলতা—শুধু একটা শান্ত সমাহিত ভাব। চারিদিকে প্রকৃতির সুন্দর শান্ত স্নিগ্ধ রূপ। দূরে নৌকা থেকে ভেসে আসছে তরুণ মাঝির গানের কয়েকটা কলি, আর দুরন্ত রাখাল বালকের মৃদু মিষ্টি বংশীর ধ্বনি আসছে তীরভূমি থেকে—এই তো কাব্যরচনা করার পক্ষে উপযুক্ত পরিবেশ। হঠাৎ আমার একটা দৃশ্যের কথা মনে হ'ল—সুন্দর সাজান রঙ্গমঞ্চ, দর্শকগণ অধীর আগ্রহে দেখেছে—নায়িকা রাজকুমারী আকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে রাজপুত্র নায়কের জন্য,—রাজকুমারীর হাতে ফুলের মালা, মুখে আসন্ন-মিলনের আভা। রাজপুত্র এল তার ভুবন আলো করা রূপ নিয়ে, পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চড়ে। রাজকুমারী ছল-ছল চক্ষে দুরু-দুরু বক্ষে অপেক্ষা করছে রাজপুত্রের কাছ থেকে কোন সান্ত্বনার বাণী শোনার জন্য, কিন্তু রাজপুত্র কথা বলে না কেন? —আসলে, সে তার পার্ট ভুলে গেছে—! আমার ভুবন আলো করা মনের সুন্দর ভাবগুলিও এই রকম দর্শকদের সামনে নির্বাক মূক হয়ে যায়—তাকে তার লাঞ্ছিত মুখ লুকোতে আবার সেই মনের গহনে তলাতে হয়।

পরিশ্রমে কী না হয়? ভাবলাম, কবিতা নাই বা লিখতে পারলাম, কিন্তু নিজের কল্পনাকে গদ্যে রূপ দিতে পারবো না কেন? তাতে তো শুধু লিখে গেলেই হ'ল—ছন্দ মেলাতে স্বর্গ-মর্ত্য খুঁজতে হবে না।

ঠিক করলাম গল্পই লিখব। কিন্তু Plot? কোন্ Plot বাছব? সমাজের বিষমতা না বেকার সমস্যা? খাদ্য সমস্যা না বাস্তুহারাদের সমস্যা? কখনো দুঃখী মাতাদের করুণ ক্রন্দন মনকে ব্যাকুল করে তুললো, কখনো অসহায় ক্ষুধার্ত শিশুদের চীৎকার মনকে আকুল করে তুললো, কখনো গরিব বিধবাদের করুণ মুখ ব্যাথায় ম্লান করে দিল। মনকে শেষঅবধি দরিদ্রের আর্ত-চীৎকারে, লক্ষপতিদের অট্টহাস্যে বিভ্রান্ত হয়ে কানে হাত চাপা দিয়ে গল্প লেখার সংকল্প ত্যাগ করতে হ'ল।

এইখানেই ইতির রেখা টান্‌লো আমার সাহিত্যচর্চা। পাঁচদিনব্যাপী ব্যর্থ পরিশ্রমের ফল হ'ল আমার সেই পাঁচটি অমিত্রাক্ষর লাইন।···তার পরের পিরিয়ডে আমার ক্লাস ছিল। কী পড়ান হয়েছিল সেদিন জানি না। নিজের অসাফল্যে, অকৃতকার্যে ক্ষুব্ধ মন নিজের গ্লানিতেই মগ্ন ছিল, হঠাৎ কানে গেল অধ্যাপকের গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর: "চেষ্টায় কী না নয়? If there is a will, there is a way", আমার বিদ্রোহী মন চীৎকার করে উঠল: না না-না, সব পারে না—অন্ততঃ কবিতা লিখতে পারে না। তার জন্য দরকার হয় ভগবানদত্ত প্রতিভার। আমার সঙ্গে কবিতা লেখার এমনই পার্থক্য—যেমন, সত্যের সঙ্গে মিথ্যার; জমিনের সঙ্গে আসমানের—আর সুন্দরের সঙ্গে অসুন্দরের।

জোনাকি

শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়

ঝিক্‌মিক্ ঝিক্‌মিক্ জ্বলে জোনাকি
আঁধারে আলোর টিপ যায় গোনা কি?
এই জ্বলে, এই নেভে—
বারেক নেয় কি ভেবে
সাথের সাথীরা সব, আছে কিনা ঠিক
এই জ্বলে, এই নেভে ঝিক্‌মিক্ ঝিক্॥

ওরে ও জোনাকি ভাই, শুনে যাওনা
তোমার খেলার দলে, মোরে নাওনা,
আলোর চুম্‌কি জ্বেলে—
আঁধারেতে ডানা মেলে
এলোমেলো নাচ কেন? যাবে কোন দিক্
এই জ্বলে, এই নেভে ঝিক্‌মিক্ ঝিক্॥

চিদাম্বরম

শ্রীঅমিতাভ ত্রিপাঠী

রাত সাড়ে ন'টায় আমাদের ট্রেন আসার কথা। কিন্তু রাত্রি সাড়ে দশটা বাজল তার দেখা নেই। শুনলুম মাদ্রাজ লাইনে এমন হামেশাই হয়। মাদ্রাজের হালচালই আলাদা। মাদ্রাজীরা দেখলুম কেউ কেউ প্ল্যাটফর্মে শুয়ে নাক ডাকাতে লাগল পর্যন্ত। ব্যাপার দেখে আমরা অবাক। শেষ পর্যন্ত এগারোটার পর ট্রেন এল। আমাদের যাত্রা হল শুরু।

সকাল বেলায় উঠেই দেখতে পেলাম চিদাম্বরম মন্দিরের চূড়া প্রভাত-রৌদ্রের আলোয় ঝলমল করছে। আমরা রাজা মুথিয়া চেট্টিয়ারের অতিথি হয়ে আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লোকেরা গাড়ী করে আমাদের নিতে এসেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়টি খুব সুন্দর। চারদিকে কত ফুল ফুটে আছে। সুন্দর সুন্দর সব বাড়ী। কিছু প্রাতঃরাশ শেষ করেই আমরা চিদাম্বরমের মন্দির দেখতে চললাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী শ্রীসোমসুন্দরমের সঙ্গে। ইনি মন্দির-স্থাপত্য বিশেষজ্ঞও বটে। মন্দির প্রবেশের রীতি অনুসারে পূর্ব দিকের গোপুরম দিয়ে আমরা মন্দিরে প্রবেশ করলাম। শুনলুম, এই গোপুরমটি অতি প্রাচীন। এর স্তরে স্তরে সুন্দর ভাস্কর্য। কোথাও কোন গন্ধর্ব বাদ্যরত, কোথার বা অপ্সরারা নৃত্য করছে। ভরতনাট্যের অঙ্গহারগুলি প্রাচীন শিল্পীর তক্ষণে সুন্দর ফুটে উঠেছে। শিবকে দেখলাম কত রূপে। কখনো তিনি আনন্দ-তাণ্ডব করছেন, কখনো ঊর্ধ্ব-তাণ্ডব। কখনো তিনি কাঙাল রূপে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে চলেছেন। গোপুরমের পর সহস্র মণ্ডপ পার হয়ে দেখলাম দেব-সভা। এখানে আরো চারটি সভা আছে: কনকসভা, চিৎসভা, লোকসভা, রাজসভা। এই জন্যই নাকি শিবের এক নাম সভাপতি। কনকসভার মধ্যে গর্ভ-গৃহ; সেখানেই আছেন নটরাজ। গর্ভ-গৃহে ঢুকে নটরাজের অভিষেক দেখলাম। মহাদেব হচ্ছেন অভিষেক প্রিয়, আর বিষ্ণু হচ্ছেন অলঙ্কার প্রিয়। এজন্য মহাদেবকে বহু দ্রব্য দিয়ে স্নান করান হয়। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত তাঁকে ছয়বার স্নান করান হয়। আমরা দেখলুম একটি সোনার কৌটা থেকে স্ফটিকের শিবলিঙ্গ বার করা হোল, তারপর দুধ, জল, মধু, তেল ও ডাবের জল দিয়ে স্নান করানো হলো। এর পর গোলাপী স্ফটিকের নটরাজকে স্নান করান হোল। এর নাম রত্নাভিষেক।

তারপর আমরা নটরাজকে দেখলুম। তাঁর অঙ্গে কত অমূল্য অলঙ্কার। মাথায় অর্ধচন্দ্র সবটাই হীরকখচিত। শিব নাকি এখানে ব্যোম বা আকাশ রূপে আছেন। একটি পর্দা বার বার তুলে আর ফেলে সেই শূন্যরূপী শিবকে দেখান হয়। শ্রীসোমসুন্দরম্ আমাদের শিবের নানা গল্প বললেন। এখানের প্রসাদ—নারকেল খণ্ড আর ভস্ম এনে দিলেন। তারপর আমরা গোবিন্দ রাজাকে দেখলুম। রাত্রে

এসে আমরা আবার নটরাজার আরতি দেখলুম। কত রকমের আলো দিয়ে আরতি হোল—কখনো কর্পূর আরতি, কখনো বিরাট প্রদীপের গাছা, কখনো মশালের মত আগুন দাউ দাউ করে জলছে।

পরদিন বিকেলে আমরা পোর্টো নোভো দেখতে গেলাম। এটা একদা পর্তুগীজদের বন্দর ছিল। সেখানে সমুদ্র-বিজ্ঞানের অধ্যাপক শ্রীশেষায়া আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। তিনি আমাদের নানারকম শামুক, মাছ, সাপ এমন কি বাচ্চা কুমীর পর্যন্ত দেখালেন। তারপর তিনি আমাদের নৌকায় করে ভেলার নদী দিয়ে নিয়ে গেলেন বঙ্গোপসাগরের কাছ পর্যন্ত। সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। একদিকে নদী অন্যদিকে সমুদ্র মধ্যে একটা বালির মস্ত চড়া। সেখানে শ্রীশেষায়া আর আমরা অনেক শামুক আর ঝিনুক কুড়োলুম। সন্ধ্যে হয়ে এল। মা তাড়া লাগাচ্ছেন। আমরা নৌকোয় উঠলুম। আকাশে একাদশীর চাঁদ। মিঃ শেষায়া বললেন, অন্ধকার রাত্রে সমুদ্র নাকি বেশী সুন্দর হয়। তখন ফসফরাসের আলো ঢেউয়ে-ঢেউয়ে জলতে থাকে। সমুদ্রকে মনে হয় জরি-বুটি দেওয়া নীলাম্বরী শাড়ী।

ফিরে এসে তিনি আমাদের নিয়ে গেলেন তাঁর গবেষণাগারে পাশের মাঠে। সেখানে হায়দার আলীর সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ হয়েছিল। তারপর তাঁর দূরবীন দিয়ে আমরা চাঁদ দেখলাম। ফেরবার সময় তিনি আমার আর আমার বোন সুদক্ষিণার হাতে অনেকগুলো ঝিনুক দিলেন।

পরদিন সকালে আমরা যাত্রা করলাম তাঞ্জোরের পথে। বহুদূর পর্যন্ত চিদাম্বরম মন্দিরের চূড়ো আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এল।

চাতক

শ্রীনির্মলকুমার চক্রবর্তী

নীল নভে উড়ে যায়, চাতক-চাতকী হায়
আশার পরশ লাগিয়া।
করুণ কাতর রবে, উড়ে উড়ে বলে সবে,
নীর লাগি' রয়েছি জাগিয়া।
ঝাঁকে ঝাঁকে ওড়ে সেথা, কালো মেঘ আছে যেথা,
তোলে নানা বিষাদের সুর
একফোঁটা পেয়ে জল, করে সবে কলকল,
শুষ্ক প্রাণ হয় যে মধুর।

—

পার্সিয়ুসের কাহিনী

শ্রীরজতকান্ত রায়

প্রাচীন গ্রীসের আর্গস অঞ্চলে অ্যাক্রিসিয়ুস নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি কখনও সুখে থাকতে পারতেন না সব সময়ই তাঁর মনে একটা প্রবল দুশ্চিন্তা ছিল। তাঁর একমাত্র মেয়ে ড্যানিই ছিল তার কারণ। এক দৈবজ্ঞ ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন—ড্যানির ছেলে অ্যাক্রিসিউসকে হত্যা করবে।

দিনে দিনে ড্যানি বাড়তে লাগলো এবং তার রূপগুণ চরিত্র বিকশিত হতে লাগলো। সে ছিল ভোরের পদ্মফুলের পেলবের মতই পবিত্র ও সুন্দর। সঙ্গে সঙ্গে অ্যাক্রিসিয়ুস-এর দুশ্চিন্তাও বাড়তে লাগলো, ক্রমশঃ দৈবজ্ঞের ভবিষ্যতবাণী তাঁর কাছে আতঙ্ক হয়ে দাঁড়ালো। অনেক ভেবে চিন্তে তিনি একটি উপায় পেলেন। আর্গস রাজ্যের বড় বড় শিল্পীদের তিনি তাঁর আদেশ জানালেন। একটা দুর্গ তৈরী করতে হবে এবং সেটি এমন প্রস্তুত হবে যে শতচেষ্টায়ও কেউ সেখান থেকে পালাতে পারবে না। শিল্পীরা তাদের কাজ আরম্ভ করলো। কিছুদিনের মধ্যেই রাজার মনের মত একটা দুর্গ তৈরী হোলো। একটি নির্জন সমুদ্রতীরে অবস্থিত, দরজা জানলা ছিল অতি অল্প এবং এত ছোট যে তার সাহায্যে পালানো কঠিন, এবং সেখান থেকে ঝাঁপ দিলে সমুদ্রের অতল গর্ভে তলিয়ে মৃত্যুবরণ করতে হবে। দরজা একটিই ছিল, এবং অনেক উঁচুতে, মই ছাড়া সেখানে যাওয়া সম্ভব নয়। ড্যানিকে রাজা এই ভয়াবহ দুর্গে বন্দী করলেন,—লোক নেই, জন নেই, নির্জন ভয়ঙ্কর সে জায়গা। দিনে একবার মাত্র মানুষের মুখ দেখতে পায় ড্যানি। একটি বোবা ক্রীতদাস খাবার দিয়ে যায়, তার সঙ্গেও কথা বলা যায় না, প্রকাশ করা যায় না মনের ভাব দুঃখ। এরকম কঠোর জায়গায় বুদ্ধি নষ্ট হয়ে যায়, পাগল হয়ে যায় মানুষ। ড্যানির সৌভাগ্য যে তা হয় নি। নির্জন নিঃসঙ্গ অবস্থায় বছরের পর বছর কেটে গেল অসহ্য দুঃখকষ্টে। ড্যানি ক্রমশঃ পূর্ণবয়স্কা হলেন, কিন্তু পৃথিবী তাঁর কাছে অজানা রয়ে গেল। তার জ্ঞানের পরিধি হোলো ক্ষুদ্র, শুধু ছোট্ট নিঃসঙ্গ এই দুর্গ ছাড়া বেশী কিছু তিনি জানতে পারলেন না। জানতে পারলেন না সুখ কাকে বলে। জানলার ধারে বসে সমুদ্রের দিকে চেয়ে তিনি দিনের পর দিন অশ্রু ফেলতে লাগলেন—শেষ পর্যন্ত তাও বুঝি ফুরিয়ে গেল, ড্যানি শেষে নিষ্প্রাণ পাথরের মত হয়ে গেলেন। কথা না বলে বলে মুখের মধ্যে এসে গেল জড়তা। সমস্ত জীবনটাই বিষাদময়, তারমধ্যে আনন্দের কণামাত্র নেই। জীবনের এই কঠোর পথে আর কতদূর চলতে হবে কে জানে। কোনও প্রবৃত্তি আর ইচ্ছা রইল না ড্যানির মনে। দিনের পর দিন তিনি শুধু মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। একদিন বিকালে ড্যানি তাঁর সোনার বিছানায় শুয়ে সূর্যাস্ত দেখছিলেন, দিনের শেষে সূর্য আকাশের গায়ে আবীর মাখিয়ে ডুবে যাচ্ছে, যেন কাঁচা

সোনার রঙ্ গুলে গেছে; অপরাহ্নের সেই উজ্জ্বল সোনালী আলো ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে আসছে, সমুদ্রের সাদা-কালো সী গালরা দল বেঁধে ফিরে আসছে ডাঙ্গার দিকে, সমুদ্রের ঢেউ গর্জন করে আছড়ে পড়ছে দুর্গের পায়ের কাছে। উজ্জ্বল সূর্য যেন পরশমণি—যা স্পর্শ করছে তাই সোনা হয়ে যাচ্ছে। একটা সোনালি রশ্মি জানলার মধ্যে দিয়ে ড্যানির মুখে এসে পড়লো। ঠিক সেই সময় ড্যানি একটি ভারী গম্ভীর স্বরে দৈববাণী শুনতে পেলেন। "বৎসে! কোন ভয় নেই। দেবরাজ জিউস তোমার সহায়, তাঁর বরে তোমার একটি পুত্র হবে ঐ সূর্যের মতই বীর উজ্জ্বল। তার নাম রেখ পার্সিয়ুস, সে তোমার দুঃখকষ্ট ঘুচাবে।" আনন্দে ড্যানির মন পরিপূর্ণ হয়ে গেল, তা-হলে এই নিরাশাময় জীবনেও আছে আশার আলো। নিশ্চিন্তে বালিশে মাথা রেখে আজ অনেকদিন পরে তিনি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হলেন। মাস কয়েক পরে ড্যানির একটি দেবশিশুর মত সুন্দর ছেলে হোলো। যথাসময়ে এ খবর রাজার কাছে পৌছুল। অ্যাক্রিসিয়ুসের আদেশে অতি নিষ্ঠুরের মত ড্যানি এবং তাঁর ফুলের মত দু'দিনের শিশুটিকে একটি বিরাট কাঠের সিন্দুকে করে ভাসিয়ে দেওয়া হোলো সমুদ্রে। ভয়ে মা জড়িয়ে ধরেন শিশুটিকে, কেঁদে ওঠেন তিনি। এখনই তাঁরা দুজন সমুদ্রের অতলগর্ভে তলিয়ে যাবেন। শিশুটির মুখেরপানে চেয়ে দুঃখ চাপতে পারেন না ড্যানি,—আহা! কতই বা ওর বয়েস, এরই মধ্যে ওকে মৃত্যুবরণ করতে হবে! নিজের জন্য দুঃখ নেই, কিন্তু সন্তানের জন্য কেঁদে ওঠে মায়ের প্রাণ। এদিকে দেবরাজ জিউসের বরে সিন্দুক ডুবলো না, ভেসে চললো সমুদ্রের বক্ষের উপর দিয়ে। অবশেষে দুই তিন দিন পরে সিন্দুক এসে লাগলো সেরিফস দ্বীপের তীরে সেখানে এক ব্যক্তি তাঁদের দেখতে পেলেন, নাম তার ডিক্‌টিস্। তিনি সিন্দুকের ডালা খুলে বিস্মিত হয়ে দেখলেন ঘুমন্ত মা আর শিশুটিকে। ডিক্‌টিস্ দুজনকে নিয়ে গেলেন নিজের বাড়ীতে। ক্রমে দুজনে ডিক্‌টিসের ক্ষুদ্র সংসারের লোক হয়ে দাঁড়ালো, ড্যানি ডিক্‌টিসের ঘরকরনা করতে লাগলেন। ডিক্‌টিস্ ছিলেন একজন সামান্য জেলে, কিন্তু তাঁর জন্ম খুবই উচ্চ বংশে। সেরিফস দ্বীপের রাজবংশের সন্তান তিনি, তাঁর ভাই পলিডেকটিস সে দেশের রাজা। ড্যানির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে পলিডেকটিস তাঁকে বিয়ে করতে চাইলেন, ডিক্‌টিস রাজী হলেন না, বললেন, "ড্যানি বিয়ে করতে চায় না, একমাত্র নিজের ছেলে ও বাড়ী ছাড়া তার কোন আকর্ষণ বা ইচ্ছা নেই।" তবুও পলিডেকটিস হতাশ হলেন না, তিনি নতুন মতলব আঁটতে লাগলেন। এদিকে পার্সিয়ুস দিনে দিনে বাড়তে লাগলো, তাঁর তেজ ও শক্তি সূর্যের মতই প্রখর হোলো এবং এইজন্য তিনি পলিডেকটিসের হিংসার কারণ হলেন। তিনি ভেবেছিলেন বিনাবাধায় জোর করে ড্যানিকে বিয়ে করবেন, কিন্তু এখন পার্সিয়ুসের মত তেজস্বী যুবক তাঁর মাকে রক্ষা করছেন। যাইহোক পলি-ডেকটিস মুখে পার্সিয়ুসের প্রতি খুব সৌজন্য দেখালেন। একদিন পার্সিয়ুসকে তিনি তাঁর প্রাসাদে

নিমন্ত্রণ করলেন। গল্প করতে করতে পার্সিয়ুস মশ্‌গুল হয়ে পড়েছিল, পলিডেকটিসের কোন বদ মতলব আছে বলে তিনি ভাবতে পারেন নি। কথায় কথায় পলিডেকটিস পার্সিয়ুসকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে, নিলেন যে পলিডেকটিসের কোন একটি ইচ্ছে পার্সিয়ুস পূরণ করবেন। অতঃপর পলিডেকটিস বললেন "আমাকে গর্জন মেডুসার মাথা এনে দিতে হবে।" পার্সিয়ুস ভাবলেন পলিডেকটিস তাঁর সঙ্গে ঠাট্টা করছেন, কিন্তু দু'দিন পরেই তিনি এর গুরুত্ব অনুভব করলেন। তিনি জানেনও না কোথায় আছে মেডুসা। ভাবলেন খুঁজে বের করবেন, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও সে জায়গা তিনি খুঁজে বের করতে পারলেন না। হতাশ হয়ে তিনি একদিন বিকালে বসেছিলেন সমুদ্রতীরে। সমুদ্র ছল্‌ছল্‌ রবে তাঁকে যেন বিদ্রূপ করছে। হঠাৎ তাঁর সামনে এক রৌপ্য বর্মমণ্ডিত দেবী আবির্ভূত হলেন। নাম অ্যাথেনা। পার্সিয়ুস বিস্মিত হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন, সারা মুখে কি স্নিগ্ধ সুষমা, চোখ দিয়ে আশার আলো ফুটে বের হচ্ছে। এ্যাথেনা বললেন, "বৎস! দেবরাজ জিউস আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন তোমাকে সাহায্য করবার জন্যে। আমি তোমায় বলে দেব গর্জন মেডুসার সন্ধান। তাকে হত্যা করা বড় কঠিন বৎস! তুমি এই চটি জোড়াটি নাও, এটি পরে তুমি শূন্য দিয়ে যেখানে খুশী উড়ে যেতে পারবে, তোমাকে এই হেলমেটটিও দিচ্ছি, এটি পরে তুমি অদৃশ্য হতে পারবে।" এ ছাড়াও এ্যাথেনা পার্সিয়ুসকে দিলেন একটা আয়নার মত চক্‌চকে পদক, তাতে ছায়া পড়ে খুব সুন্দর আর দিলেন একটি বাঁকানো ছোরা। এ্যাথেনার কাছে বহু দরকারী কথা ও উপদেশ নিয়ে পার্সিয়ুস বেরিয়ে পড়লেন এই ভীষণ বিপজ্জনক অভিযানে। তিনচার দিন ক্রমাগত তিনি উড়ে চললেন রাইন ও ডানিউব নদী পার হয়ে। অবশেষে এসে পড়লেন গ্রেহাইদের দেশে। তার চারদিকে সমুদ্র, কখনও এখানে সূর্য ওঠে নি, চাঁদের মুখ দেখা যায় নি। সব সময় সন্ধ্যার একটা অতি মৃদু আলো, চিররাত্রির দেশ সেটা। আঁধার, ঠাণ্ডা ধূসর বর্ণের রাত, বড় ভীষণ আনন্দহীন সে দেশ। সেখানে বাস করে গর্জনদের তিন বোন গ্রেয়াইরা। যাই হোক পার্সিয়ুস অগ্রসর হলেন অদৃশ্য হয়ে। অবশেষে এসে দাঁড়ালেন এক গ্রামদের কাছে, এখানেই তারা বাস করে। এই গ্রেয়াইদের তিনজনের মাত্র একটি চোখ ও দাঁত, পরস্পর আদান-প্রদান করে প্রত্যেকে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পরে থাকে, তারপর অন্যজনকে দেয়। তারাই একমাত্র পৃথিবীতে জানতো গর্জনদের সন্ধান। পার্সিয়ুসের আগমন বুঝতে পেরে দুই গ্রেয়াই চেঁচিয়ে উঠলো চোখ দাও, চোখ দাও, কেউ একজন এসেছে। এক গ্রেয়াই যখন অন্য গ্রেয়াইকে চোখ দিতে গেল, সেই সময়ে পার্সিয়ুস অ্যাথেনার উপদেশ মত খপ করে চোখটি নিয়ে নিলেন। কিছুক্ষণ পরে একজন গ্রেয়াই চেঁচিয়ে উঠলো—"চোখ দিলে না যে এখনও?" "দিয়ে দিয়েছি ত।"—উত্তর দিল আর একজন। কিছুক্ষণ পরেই গ্রেয়াইরা টের পেল যে শত্রু তাদের একমাত্র চোখ হরণ করেছে। তারা কেঁদে ককিয়ে বললো,—"চোখ ফিরে দাও দয়া করে।"

পার্সিয়ুস বললেন, "যদি গর্জন মেডুসার সন্ধান বলে দাও তবেই আমি চোখ ফিরিয়ে দেব, নতুবা তোমরা চিরকাল অন্ধ হয়ে থাকবে।" প্রথমে গ্রেয়াই বোনেরা রাজী হোলো না, তারা অনেক অনুনয়-বিনয় করলে, ক্রোধ প্রকাশ করে মৃত্যুর ভয়ও দেখালে, কিন্তু পার্সিয়ুস তাঁর সঙ্কল্পে অটল রইলেন। অনেক চেষ্টায়ও যখন গ্রেয়াইরা পার্সিয়ুসের মন গলাতে পারলো না, তখন তারা বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি করে গর্জনদের সন্ধান বলে দিল। পার্সিয়ুস তাদের চোখ ফিরিয়ে দিয়ে আবার উড়ে চললেন দক্ষিণ দিকে স্পেন পার হয়ে। অবশেষে তিনি এসে নামলেন ওসোনাস দ্বীপে যেখানে থাকে ভয়াল গর্জনরা। এখানেও গ্রেয়াইদের দেশের মত অন্ধকার, চারদিকে পোড়া গাছপালার বড় বড় মোটা গুঁড়ি আর সমুদ্রের তীরে বিরাট গুহা, তাতেই বাস করে দানবী গর্জনেরা।

মেডুসা! অদ্ভুত নিষ্ঠুরতাপূর্ণ নাম এবং তেমনি নিষ্ঠুর তার চেহারা ও চরিত্র। ওর সাপের মত ক্রুর মুখের দিকে যে তাকাবে সেই পাথর হয়ে যাবে। মেডুসা গর্জনদেরই একজন। বাকী দুজনের নাম স্থেনো এবং ইউরিয়াল, মেডুসাই বড়। সে কুৎসিত নয়—দানবী হলেও মুখে তার একটা অদ্ভুত অদ্ভুত নিষ্ঠুর সৌন্দর্য। ওষ্ঠ পুরু, নাক তীক্ষ্ণ আর অদ্ভুত বড় বড় ড্যাবড্যাবে সর্পচক্ষু, ঠাঁটের নীচে থুঁৎনীর রেখাটি যেন নিষ্ঠুরতায় তৈরী, মাথার চুল সব সাপ, অসংখ্য সাপ মাথা জড়িয়ে রয়েছে। নিঃশ্বাসে গরম বাতাসের হল্কা বের হয়—তাতে পুড়ে যায় সব। এখানকার পাখীগুলোও অতি বীভৎস। তাদের চীৎকার কর্কশ—দেখতে বিরাট ও কুৎসিত। পার্সিয়ুস অদৃশ্য হয়ে এখানে উপস্থিত হলেন। স্থেনো এবং ইউরিয়াল ঘুমন্ত অবস্থায়। তারা অমর, মৃত্যু তাদের নেই; সুতরাং তাদের ছেড়ে পার্সিয়ুস মেডুসার দিকে নজর দিলেন। তিনি চুপি চুপি দেবী এ্যাথেনার বাঁকানো ছুরিটি নিয়ে তার পিছন দিয়ে এগোলেন—তাঁর উপদেশ মত মেডুসার দিকে তাকালেন না একবারও, তাকালেই পাথর হয়ে যাবেন। এইবার পদকটির উপর মেডুসার মুখের ছায়া পড়লো, পার্সিয়ুস তার চোখ দুটো দেখে থমকে দাঁড়ালেন। তার মনে একটা ভীতি জেগে উঠলো, কিন্তু সে ভয় তিনি ঝেড়ে ফেলে আরো অগ্রসর হয়ে একেবারে মেডুসার পিছনে এসে পদকের দিকে তাকিয়ে ছোরা মারলেন সর্বশক্তি দিয়ে। পার্সিয়ুসের হাতের প্রচণ্ড আঘাতে মেডুসার মাথা ছিটকে মাটিতে পড়লো এবং মরবার আগে মেডুসা একটা অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণকণ্ঠে মরণ-আর্তনাদ করে উঠলো। পার্সিয়ুস চোখ বুজে মুণ্ডটি থলেতে পুরলেন। এদিকে বাকী দুই গর্জন জেগে উঠলো। পার্সিয়ুস তাঁর জুতোর সাহায্যে তীব্রবেগে উড়ে চললেন দেশের দিকে।

কয়েকদিন পরে তিনি এসে নামলেন ইথিওপিয়ায়। সেখানে সমুদ্রতীরে বেড়াতে গিয়ে তিনি দেখলেন এক অদ্ভুত দৃশ্য। তখন অপরাহ্ণ হয়ে এসেছে। হঠাৎ দেখলেন সমুদ্রের, উপর বিরাট পাথরের শৃঙ্খলে আবদ্ধ একটি পরমাসুন্দরী মেয়ে। মুখ অত্যন্ত বিষণ্ণ ও ভয়ার্ত। সেখানে অন্য কোন মানুষ

নেই। পার্সিয়ুস তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে হেলমেট্ খুলে দেখা দিয়ে তাঁর এই অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। মেয়েটির মুখ আরও বিষণ্ণ হয়ে গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলতে লাগলো: "আমিই রাজা মিফাসের মেয়ে এ্যানড্রোমিডা। আমার মা ক্যাসিওপিয়া গর্বভরে আমাকে দেবীদের চেয়েও সুন্দরী বলেছিলেন তাই সমুদ্র দেবতা পসিডন ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে ভীষণ এক সাজা দিলেন। সমুদ্র রোষে ফুলে ফেঁপে উঠে প্রবলবেগে দেশের উপর দিয়ে ধেয়ে এলো সব ভাসিয়ে দিয়ে এবং সেই বানের চেয়ে ভীষণ এক দানব উঠে এলো সমুদ্র থেকে ইথিওপিয়াকে ছারখার করে দিতে। সমস্ত দেশে হাহাকার উঠলো। অবশেষে রাজা মিফাস বিপদ বুঝে আমাকে পসিডনের কাছে উৎসর্গ করে এইখানে বেঁধে রেখেছেন—কিছুক্ষণ পরেই সেই দানবটা আমাকে খেয়ে ফেলবে।"—এই বলে এ্যানড্রোমিডা কেঁদে উঠলো মুখ ঢেকে। পার্সিয়ুস ছোরা দিয়ে তাকে বন্ধনমুক্ত করে একটা পাহাড়ের শৃঙ্গে রেখে সেই পাথরের উপর এসে দাঁড়ালেন। ঠিক সেই সময় সমুদ্রে একটা বিরাট আলোড়ন দেখা দিল, পাহাড়ের মত উঁচু ঢেউ উঠলো এবং কিছুক্ষণ পরেই সমুদ্রের বুক থেকে মাথা তুলল এক বিশাল ভয়ঙ্কর ড্রাগন জাতীয় দানব। নিঃশ্বাসে যেন ঝড় বইছে, চোখ দুটো ঘোলাটে, মুখের মধ্যে তীক্ষ্ণ কয়েকজোড়া ধারালো দাঁত। মুখের উপর ছুরির ফলার মত অনেক কাঁটা, হাঁ-টা গুহাগহ্বরের মত বিরাট। ভীষণ একটা গোঁ-ও-ও-ও গর্জন করে সে তেড়ে এল পার্সিয়ুসের পানে। পার্সিয়ুস ক্ষিপ্রগতিতে পাশে সরে গিয়েই সর্বশক্তি দিয়ে ছোরা মারলেন তার গলায়। হঠাৎ ফিন্‌কি দিয়ে ফোয়ারার মত কালো রক্ত গল্‌গল্ করে বের হতে লাগলো। দানবটার ভীষণ গর্জনে আকাশ বাতাস যেন থরথর করে কেঁপে উঠলো। এইবার বিরাট হাঁ করে পার্সিয়ুসকে গিলতে গেল সে। পার্সিয়ুস ভয় পেলেন না, আবার একটু সরে গিয়ে ছোরার আঘাত হানলেন বার বার, রক্তে সমুদ্রের রঙ কালো হয়ে গেল। অবশেষে দানবটা ওঁ-ওঁ রবে একটা করুণ আর্তনাদ করে টলতে টলতে ঝপাৎ করে গিয়ে পড়লো সমুদ্রের জলে। এইবার পার্সিয়ুস উঠে এলেন এ্যানড্রোমিডার কাছে। দুজনেই দুজনের রূপ ও শৌর্যে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। পার্সিয়ুস আর এ্যানড্রোমিডা অতঃপর মিফাসের রাজপ্রাসাদের দিকে চললেন। রাজা মিফাস তাঁর কন্যাকে জীবিত দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পার্সিয়ুসকে বললেন, "তুমি কী চাও?" পার্সিয়ুস একটু লজ্জিত হয়ে দেখিয়ে দিলেন এ্যানড্রোমিডাকে। মিফাস বুঝলেন পার্সিয়ুসের ইঙ্গিত, খুসীও হলেন, পার্সিয়ুসের মত বীর জামাতা ক'জন পায়? শুভলগ্নে পার্সিয়ুস ও এ্যানড্রোমিডার বিয়ে হয়ে গেল। কয়েকদিন সেখানে মহা আনন্দে কাটিয়ে পার্সিয়ুস এ্যানড্রোমিডাকে নিয়ে দেশের দিকে চললেন। দেশে এসে তিনি দেখলেন, পলিডেকটিসের অত্যাচারে অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তাঁর মা এবং পিতামহতুল্য ডিকটিস দেবরাজ জিউসের মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছেন, কিন্তু নির্লজ্জ পলিডেকটিস দেবরাজ জিউসের মূর্তির সামনে প্রার্থনারত ড্যানিকে ধরবার

জন্য সৈন্যসামন্তসহ অগ্রসর হচ্ছেন। ডিকটিস একাই ড্যানিকে রক্ষা করবার জন্য অস্ত্র ধরেছেন। হঠাৎ পার্সিয়ুসকে জীবিত অবস্থায় ফিরে আসতে দেখে পলিডেকটিস মহা ক্রুদ্ধ হয়ে সৈন্যদের বললেন, "ওকে হত্যা কর।" সৈন্যদল হৈ হৈ করে তাঁর দিকে তেড়ে এলো। ভয়ে ডিকটিস ও ড্যানি চোখ বুজলেন। সুযোগ বুঝে পার্সিয়ুস চট করে মেডুসার কাটা মুণ্ড বের করে চোখ বুজে তা তুলে ধরলেন পলিডেকটিস ও তাঁর অনুচরদের পানে। মেডুসার মুখের পানে তাকাতেই সকলে মুহূর্তের মধ্যে যে যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় দাঁড়িয়ে পাথর হয়ে গেল। ডিকটিস ও ড্যানি বেঁচে গেলেন—মেডুসার মুখের পানে তাকান নি বলে। পার্সিয়ুস তাড়াতাড়ি বিপজ্জনক মাথাটিকে থলেতে পুরলেন। আজ বহুদিন পরে মা ও এ্যানড্রোমিডাকে নিয়ে পার্সিয়ুস চলে গেলেন তাঁর নিজ দেশ, নিজ রাজ্য আর্গসে। এদিকে রাজা অ্যাক্রিসিয়ুস বৃদ্ধ হয়েছেন—অথচ রাজ্যের উত্তরাধিকারী পার্সিয়ুস নেই। বহুদিন ড্যানিকে না দেখে তাঁর অনুতাপও হয়েছিল। তাই পার্সিয়ুসদের দেখে তিনি মহা আনন্দে তাঁদের সম্বর্ধনা করলেন। এর পর একদিন রাজা ও পার্সিয়ুস ডিসকাস ছোড়ার প্রতিযোগিতা করছিলেন। পার্সিয়ুস একবার তাঁর ডিসকাসটা প্রচণ্ড বেগে ছুড়ে দিলেন, কিন্তু দৈবক্রমে তা লেগে গেল বৃদ্ধ রাজার মাথায়। তিনি সেখানেই নিহত হলেন। এইভাবে হত্যা করবার জন্য পার্সিয়ুস ভীষণ অনুতপ্ত হয়ে রাজ্যভার দিয়ে দিলেন তাঁর এক খুড়তুতো ভাই মেগাপেনথিসকে এবং নিজে মিসিনা নগরী সৃষ্টি করে সেখানে এ্যানড্রোমিডা ও মাকে নিয়ে সুখে দিন অতিবাহিত করতে লাগলেন।*

* গ্রীক পুরাণ অবলম্বনে

শিয়াল রাজা

শ্রীমোহিনীমোহন গাঙ্গুলী

বনের ধারে শিয়াল রাজার মস্ত বড় বাড়ি,
বাড়ির মাঝে আবার আছে ট্যাক্সি মোটর গাড়ি।
সিংহ মশায় সেনাপতি মন্ত্রী চিতা বাঘ,
হালুম মামা খাবার এনে মাংস করে ভাগ।
ইঁদুর, বিড়াল, গঙ্গাফড়িং ব্যাং ব্যাঙাচি ভুলো,
কাছিম, বাদুড়, সবাই আছে রাজ্য করি আলো।
কোকিল, টিয়া, পাপিয়ারা সভায় করে গান,
ময়ূর নাচে পেখম তুলে, গাধা ধরে তান।
পেচক হলেন বিচারপতি, বানর দারোয়ান,
হাতির 'পরে চড়ি' রাজা দিগ্বিজয়ে যান।
কাকাতুয়া ময়না পাখী দু'জন বডিগার্ড
দু'জন দুটো অস্ত্র নিয়ে যাচ্ছে চমৎকার।
শিয়ালরাজা আচ্ছা তাজা দিলদরিয়া প্রাণ,
নিত্য নূতন খেয়াল মত আদেশ করেন দান।
এসব মজা দেখবে যদি একটা তুলে ঠ্যাং
মাদল এনে বাজাও জোরে, ড্যাড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং।

শিক্ষার আদর্শ

শ্রীঅরুণকুমার দে

আজ আমি তোমাদের শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে কিছু বলব।

শিক্ষার মধ্যে মোট চারটি H আছে। এই চারটি H হচ্ছে ঃ ১। Head বা মস্তিষ্ক। ২। Health বা স্বাস্থ্য। ৩। Hand বা হাত। ৪। Heart বা হৃদয়। আগের দিনে যে শিক্ষার ব্যবস্থা চালু ছিল, তা ছিল শুধু Head, অর্থাৎ মস্তিষ্কের চালনা। অন্য তিনটি H কে তখন তুচ্ছ করা হোত। কিন্তু সামাজিকতা বা সমাজ সেবার প্রয়োজনে, অন্য তিনটি H এর আবশ্যকতা অতি প্রয়োজন। Health বা স্বাস্থ্যের জন্য শিক্ষা পেতে হবে—লেখাপড়া বা অন্যান্য শারীরিক শিক্ষার মাধ্যমে। Hand বা হাতের কাজের জন্য শিক্ষা লাভ করতে হবে—কোন প্রকার ব্যবহারিক শিল্প শিক্ষার মাধ্যমে। Heart বা হৃদয়ের উৎকর্ষতা শিক্ষা পেতে হবে—স্কুল ও কলেজের সমবেত ছাত্রদের সঙ্গে প্রাণের আদান-প্রদানে—স্কুল ও কলেজের প্রতিটি ছাত্রের পরস্পরের সঙ্গে সৌহার্দ্য-সহানুভূতি, বন্ধুতা, আন্তরিকতা ও কৃতজ্ঞতা বন্ধনের সূত্রে বাঁধা পড়তে হবে, তবেই হবে শিক্ষার পূর্ণতা।

মহাপুরুষ মহম্মদ

মুসাম্মৎ অহেদা খাতুন

নিবিড় তমসা ঘিরিয়া রাখিছে আরবের মরুভূমি
দিগন্তে নাই আলোক-বিন্দু, নিঃসাড় বালুকা চুমি।
হিংসার বিষ-বাতাসে পূর্ণ মানুষের অন্তর,
বিদ্বেষ-বিষ, হানাহানি আর কুটিলতা, সহচর।
লোভ ও দ্বন্দ্বে রক্তপ্রবাহ নিয়ত প্লাবিত সেথা,
অন্যায়, অসত্য-পূর্ণ চিত্তে ভরা নিতি কলুষতা।
বিলাসের স্রোতে প্লাবিত হতেছে সততার অবশেষ,
পাপের চলেছে তাণ্ডব নাচ ধর্মের নাই লেশ।

তোমার জন্মে উদিল আরবে সত্যের নবারুণ,
মানবতা সেথা লভিল আলোক, শেখালে মহৎ গুণ।
উৎপীড়িত যারা হ'ল নির্ভয়, ন্যায়ের ভরসা পেয়ে,
আশার আলোকে জাগিল বিশ্ব, নবজীবনের গান গেয়ে।
সাম্যের বাণী কম্বুকণ্ঠে ধ্বনিত দিগ্বিদিক,
শত্রুমিত্র নাই ভেদাভেদ বক্ষে টানিয়া নিক।
প্রীতি ও প্রেমের আলিঙ্গনে মুগ্ধ করেছো সবে,
হে লোকগুরু, মানবের হিতে এসেছিলে এই ভবে।

জাগছে গাধার চেতন

কুমারী কল্যাণী চক্রবর্তী

সন্ধ্যেবেলা ধোপার মেলা
দড়ি হাতে ধ'রে
গাধার গায়ে বোঁচকা দিয়ে
ঘরের পানে ফেরে।
সেদিন দেখি কাণ্ড একি!
ধোপার পরিবার
কাঁধে পিঠে বোঁচকা নিয়ে
চলছে সারে সার।
শুধাই তাদের, "গাধা তোদের
গিয়েছে কি মারা?"
বল্লে সবাই, "তা নয় মশাই
ষ্ট্রাইক্ করে তারা।"
বলছি শোন, গল্প কোন
নয়কো যেমন-তেমন
শুনবে যখন বুঝবে তখন
জাগছে গাধার চেতন।
হ'চ্ছে তোফা গাধার সভা
প্রশ্ন মনে সবার ঃ
মোদের গর্ব মোদের দর্প
কম কি অধিকার?
না হয় মোরা বইছি বোরা
সব প্রাণীরই হেয়
তাই ব'লে কি ক'রব নাকি
সহ্য এমন কেহ?
আর পারিনা মানতে মানা
গাবোই এবার গান
বইছে হাওয়া গাওনা ভায়া
গানের সাথে তান।
পাকা ধানে মইটি টেনে
করিনিতো ক্ষতি
কেন তবে বাধা দেবে
এমন কেন মতি!
সবাই তখন হ'ল মগন
করতে গানের রেওয়াজ
ঘ্যাঁক্কো ঘোঁৎ ঘ্যাঁক্কো ঘোঁৎ
বিচিত্র সে আওয়াজ।
হায়রে ধর্ম! গানের মর্ম
বুঝলোনাকো কেউ
ছুটোছুটির পেটাপেটির
লাগল এসে ঢেউ।
মনের দুঃখে মুখটি বুজে
গাধারা হয় হাওয়া
তার পরেতে বোঁচকা নিতে
ষ্ট্রাইক্ হ'ল চাওয়া?

খেলাধুলার খবর

মেঠুড়ে

পদ্মশ্রী

ভারতে সাধারণতন্ত্র দিবসে খেতাব বিতরণ উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ভারতের অলিম্পিক দৌড়বীর মিলখা সিং এবং ইংলিস চ্যানেল সাঁতারু শ্রীমিহির সেনকে 'পদ্মশ্রী' আখ্যায় ভূষিত করেছেন।

—

ডন ব্র্যাডম্যানের বিশ্বরেকর্ড ম্লান

পাকিস্তানের একুশ বছরের টেস্ট খেলোয়াড় হানিফ মহম্মদ ৫৯৯ রান করে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় ব্যক্তিগত রান সংখ্যার নতুন বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করেছেন। রণজি ট্রফি প্রতিযোগিতার মতনই কায়েদ-ই-আজাম ট্রফির গত বছরের বিজয়ী ভাওয়ালপুর দলের বিরুদ্ধে করাচীর পক্ষে খেলে হানিফ মহম্মদ দশ ঘণ্টা পঁয়ত্রিশ মিনিট ব্যাট করেন। কোনো চান্স দেন নি।

১৯২৯-৩০ সালে চব্বিশ বছর বয়সে ডন ব্র্যাডম্যান (নিউ সাউথ ওয়েলস) কুইন্সল্যাণ্ডের বিপক্ষে ৬ঘ. ৫৫ মিনিট খেলে অপরাজিত থাকেন। তিনি ৪৫২ রান করেন। প্রায় তিরিশ বছর ব্র্যাডম্যানের বিশ্বরেকর্ড কেউ ভাঙতে পারেন নি। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় যাঁরা চারশোর ওপর রান করেছেন, হানিফ মহম্মদ তাঁদের ভেতর পঞ্চম। আর চারজনের নাম: ১। ব্র্যাডম্যান: ৪৫২ নট আউট। নিউ সাউথ ওয়েলস বনাম কুইন্সল্যাণ্ড (১৯২৯-৩০)। ২। বি. বি. নিম্বলকার: ৪৪৩ নট আউট। মহারাষ্ট্র বনাম পশ্চিম ভারত (পুনা ১৯৪৮-৪৯)। ৩। বিল পন্সফোর্ড (অষ্ট্রেলিয়া): ৪৩৭। ভিক্টোরিয়া বনাম কুইন্সল্যাণ্ড (মেলবোর্ণ ১৯২৭-২৮)। ৪। বিল পন্সফোর্ড: ৪২৯। ভিক্টোরিয়া বনাম টাসমানিয়া (মেলবোর্ণ ১৯২২-২৩)। ৪। আর্চি ম্যাকলরেন (ইংল্যাণ্ড): ৪২৪। ল্যাঙ্কশায়ার বনাম সমারসেট (টনটন ১৮৯৫)।

গত বছর জানুয়ারি মাসে কিন্সটনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে পাকিস্তানের পক্ষে মোট ১৬ ঘ. ১৩ মিনিট ব্যাট করে হানিফ মহম্মদ প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় ব্যাটিং-এর দীর্ঘতম সময়ের রেকর্ড স্থাপন করেন। তাঁর ৩৩৭ রান টেস্ট ম্যাচে তৃতীয় সর্বোচ্চ রান সংখ্যা।

—

আই. এফ. এ. শীল্ডের ফাইন্যাল

গত ২৯ জানুয়ারি আই. এফ. এ. শীল্ডের বহু-দিনের প্রতীক্ষিত পুনরনুষ্ঠিত ফাইন্যাল খেলায় ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তাদের পুরনো প্রতিদ্বন্দ্বী মোহন-বাগান দলকে ১-০ গোলে হারিয়ে দিয়ে সাত বছর পরে আবার শীল্ড জয়ের কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। তারতম্যের বিচারে সেদিন ইস্টবেঙ্গল দল প্রতিপক্ষ দলের তুলনায় অনেকাংশে ভালো খেলেন। বিরতির পর বলরামের ফ্রি কিক থেকে নারায়ণকে বল দিলে শেষোক্ত খেলোয়াড় তাতে তীব্র সট করেন। বল বারে লাগার পর গোল-রক্ষক এ. বসুর গায়ে লেগে গোলে প্রবেশ করে (১-০)। ইস্টবেঙ্গল জয়ী হয়।

—

ফ্লাইট সার্জেণ্ট জগদীশ সা

সারমপুর শিবিরের পাঁচ নম্বর ট্রুপের ফ্লাইট সার্জেণ্ট জগদীশ সা এ বছর দু নম্বর বেঙ্গল এয়ার স্কোয়াড্রেনের (এন. সি. সি-র বিমান শিক্ষার্থী বিভাগ) শ্রেষ্ঠ কাডেট মনোনীত হয়ে দীপক সেন স্মৃতি কাপ লাভ করেন। শ্রীমান সা কলকাতার হিন্দি স্কুলের ছাত্র।

—

বুলগেরিয়া একাদশ বনাম আই. এফ. এ.

গত ২৪ জানুয়ারি ক্যালকাটা মাঠে বুলগেরিয়া একাদশ বনাম আই. এফ. এ. একাদশের প্রদর্শনী ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ভারত সফরে বুলগেরিয়া দলের এটাই ছিল প্রথম খেলা। বুলগেরিয়া দল মেলবোর্ণে অলিম্পিক খেলায় ভারতকে হারিয়ে দিয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিল। মেলবোর্ণে অনুষ্ঠিত অলিম্পিক খেলায় অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের ভেতর মাত্র একজন খেলোয়াড়ই ভারতে এসেছেন।

খেলা শুরু হবার দু'মিনিটের ভেতরই আই. এফ. এ. দল এগিয়ে যায়। দামোদরণই এই সময় একটি বল টেনে নিয়ে প্রদীপ ব্যানার্জিকে দেন। ব্যানার্জি দামোদরণকে বল ফেরত পাঠালে শেষোক্ত খেলোয়াড় গোল লক্ষ্য করে তীব্র সট করেন। দামোদরণের সটের পর বল গোল-রক্ষকের হাত থেকে ফিরে গোলের কাছাকাছি জায়গার ভেতর থাকার সময় সুযোগ সন্ধানী বলরাম সহজ সুযোগ পেয়ে বল গোলের ভেতর ঠেলে দেন (১-০)। বুলগেরিয়া এই গোল শোধ করে খেলা ভাঙবার মাত্র কয়েক মিনিট আগে। ভ্যাসিলভ দূর থেকে একটি সট করলে বদলী এস. মণ্ডল বলটি ঠিকমত আয়ত্তে আনতে পারেন নি, ফলে মণ্ডলের হাত থেকে বল ম্যালিমভের বদলী খেলোয়াড় ডুশেভের কাছে দেওয়া মাত্র তিনি গোল শোধ করে দেন (১-১)। এইভাবে বুলগেরিয়া দলের সঙ্গে আই. এফ. এ-র প্রদর্শনী ফুটবল খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়।

—

স্কুল ক্রিকেট লীগে বোলারদের প্রাধান্য

কলকাতা স্কুল ক্রিকেট লীগে যে সমস্ত খেলা হয়ে গেছে তাতে বোলারদের প্রাধান্য বিশেষভাবে দেখা গিয়েছে। ওরিয়েন্টাল দলের এ. ব্যানার্জি সাহা নগরের বিপক্ষে একটি 'হ্যাট-ট্রিক'-সমেত ৬ রানে ৮ উইকেট লাভ করে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এ ছাড়া চিত্তরঞ্জনের ইউ. বর্মণ (১২ রানে ৭) এবং অভয়চরণের আর দে-ও (৭ রানে ৫) যথাক্রমে বাঙ্গুর ও রাজেন্দ্রনাথের বিপক্ষে ভালো বল করে নিজের নিজের দলকে জয়লাভে বিশেষ সাহায্য করেন।

—

সাঁতারে বিশ্বরেকর্ড

এম্পায়ার ক্রীড়ায় সন্তরণ চ্যাম্পিয়ন অষ্ট্রেলিয়ার বেভারলি বেনব্রিজ ২২০ গজ বাটারফ্লাই সাঁতারে মহিলাদের বিশ্ব রেকর্ড ভেঙেছেন। আন্তর্জাতিক সন্তরণ সঙ্ঘ ১৯৫৭ সালে এই দূরত্বের জন্যে সময় ঠিক করার পর মহিলাদের ভেতর বেনব্রিজই তা সর্বপ্রথম অতিক্রম করেন। বেনব্রিজ ২ মি. ৪৩৮ সেকেণ্ডে নির্দিষ্ট পথ অতিক্রম করেন। এই সময়ে আন্তর্জাতিক মানের চেয়ে ০.৬ সেকেণ্ড কম।

—

ন' মিনিটে ৮৮০ গজ সাঁতার

অষ্ট্রেলিয়ার তরুণ সাঁতারু বিশ্বখ্যাত জন কনরাডস্ ৮৮০ গজ এবং ৮০০ মিটার ফ্রি স্টাইল সাঁতারে ন মিনিটের 'গণ্ডী অতিক্রম করেন।

নিউ সাউথ ওয়েলস সন্তরণ প্রতিযোগিতায় জন কনরাডস্ ৮ মি. ৫৯.৬ সেকেণ্ড ৮৮০ গজ সাঁতার (ফ্রি স্টাইল) কেটে ৮০০ গজ ও ৮৮০ মিটার সাঁতারে নিজেই বিশ্বরেকর্ড ১৪.৯ সেকেণ্ডের চেয়েও কম করেন। খেলার জগতে কনরাডস্-এর এ কীর্তি অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। লোকে চার মিনিটে মাইল দৌড়ের কথা বলে থাকে, কিন্তু এই সাফল্য তার চেয়েও অনেক কঠিন।

—